দু'চোখ যেদিকে যায়

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দু' চোখ যেদিকে যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট্, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৬

দাম পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

বিলু, তুতুন, লালু
ও
বাবলুকে

উপহার

দু' চোখ যেদিকে যায়

প্রথম পর্ব্ব

সেদিন বিকালে মণ্টুদের একটা ম্যাচ ছিল। এ-পাড়ার সঙ্গে ও-পাড়ার। কিন্তু ভূগোলের মাষ্টার নারাণবাবু অতিশয় কড়া প্রকৃতির লোক। ঠিক সেই দিনই তিনি মণ্টুদের ক্লাসশুদ্ধ 'ডিটেন' করিয়া, কামস্কাটকার রাজধানী কি এবং হনুলুলুতে কি জন্মে এই সব মুখস্থ করাইয়া লইয়া তবে পাঁচটার সময় ছাড়িলেন। এদিকে সাড়ে পাঁচটায় ম্যাচ আরম্ভ!

মণ্টু ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসিয়াই পথ হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বৌদি, খেতে দাও।'

বুড়ো পিসীমা রোয়াকের উপর বসিয়া পাকা তেঁতুলের খোসা ছাড়াইতেছিলেন। ঝাঁঝাঁ গলায় বলিলেন, 'হাত-পা ধো—জামা-কাপড় ছাড়! —তা' না পথ থেকেই ভাত দাও! ম্লেচ্ছ নাকি?'

মণ্টু কথা বলিল না। আজ তাহাদের সহিত ও-পাড়ার 'ডায়না ক্লাবের' ম্যাচ। ধীরাজ ছেলেটার ভারী অহঙ্কার। আজ মণ্টু দেখাইয়া দিবে, এরা মালোপাড়ার 'প্লেয়ার' নয় যে, পাঁচ গোলে হারিয়া মরিবে! এটা 'ইয়ং স্পোর্টিং'। ধীরাজের বুজরুকি আজ সে ভাঙ্গিবেই। মণ্টু তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর হড়-হড় করিয়া এক ঘটি জল পায়ে ঢালিয়া, আবার ডাকিল, 'বৌদি।'

বৌদি তখন ও-পাড়ার অঞ্জুর চুল বাঁধিতে ব্যস্ত। আজ তাহাকে কাহারা দেখিতে আসিবে। বৌদি বলিলেন, 'তোমার খাবার রান্নাঘরের মেঝেতে ঢাকা আছে দেখ।'

'না, তুমি শীগ্‌গির দিয়ে যাও।'

'আমার এই চুল আর তেলের হাতে কি ক'রে তোমায় খাবার দেবো?'

মণ্টু মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার দেরী করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা খুলিতে গিয়া দেখিল, শিকল বড় উঁচুতে এবং উহা শক্ত করিয়া আঁটা; সাড়ে পাঁচটায় খেলা আরম্ভ হইবে। মণ্টুর মন খেলার দিকে পড়িয়া আছে। এদিকে বাড়ীর নীচেই মাঠে বল আসিয়া গিয়াছে। দুমা-দুম্ বলের শব্দ আসিতেছে। মণ্টু তাড়াতাড়ি একটা ভাঙ্গা টুল পাতিয়া দরজা খুলিতে গেল,—দুম্!

মণ্টু উল্টাইয়া টুল লইয়া পড়িয়া গেল। কে যেন মাঠের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'গুড্ শট্!'

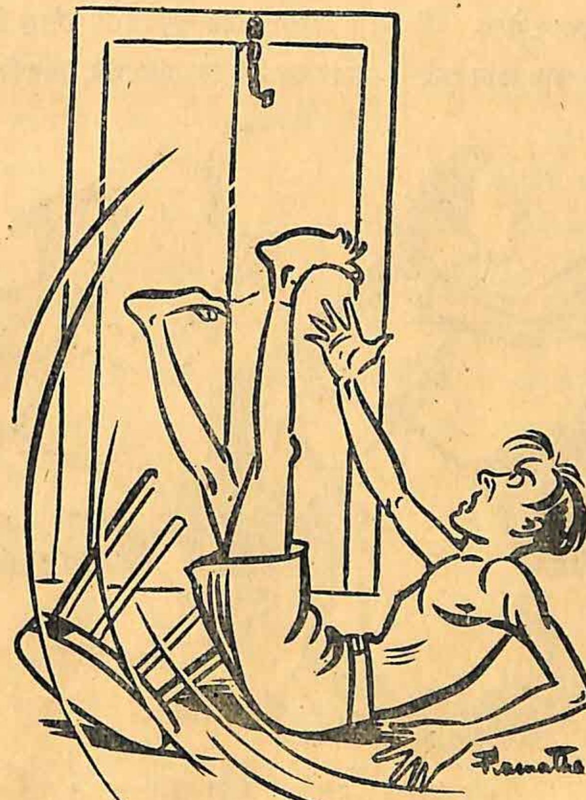
উঃ! পড়িয়া গিয়া মণ্টুর হাঁটুতে ভয়ানক লাগিল। যতগুলা লোক, সব আজ ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মণ্টু চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমি ভাঙব দরজা, ভাঙব শিকল।' অঞ্জু রবি ঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ 'রিসাইট' করিয়া প্রাইজ পাইয়াছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—'আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, আমি ছুটিব পাগল-পারা"—

অঞ্জু মেয়েটিও কম নয়! রাগে মণ্টুর মাথা গরম হইয়া গেল। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। ভাঙ্গা টুল লইয়া সে পিসীমার দিকে ছুটিল,—বৌদি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন,—'বীর ত' কম নয়!—একেবারে জিতেন বাঁড়ুয্যে!'

এদিকে মাঠে বারংবার হুইসেল পড়িতেছে। পিসীমা উঠিয়া পড়িতেই মণ্টু তাঁহার বঁটি লইয়া বৌদিকে তাড়া করিল।

'ওমা, খুন করবে নাকি?'—বৌদি পুকুরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু 'ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের' ক্যাপটেন মণ্টু ব্যানার্জ্জির সঙ্গে ছুটা সহজ কথা নয়। মণ্টুর মা

পুকুর-পাড়ের বাগানে পুঁইয়ের ডাঁটা কাটিতেছিলেন। 'মাগো আমায় খুন ক'রে ফেল্‌ল' ব'লে মণ্টুর বৌদি তাঁর কাছে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু এ সময় এখানে মা আছেন তাহা মণ্টুই বা কিরূপে জানিবে?

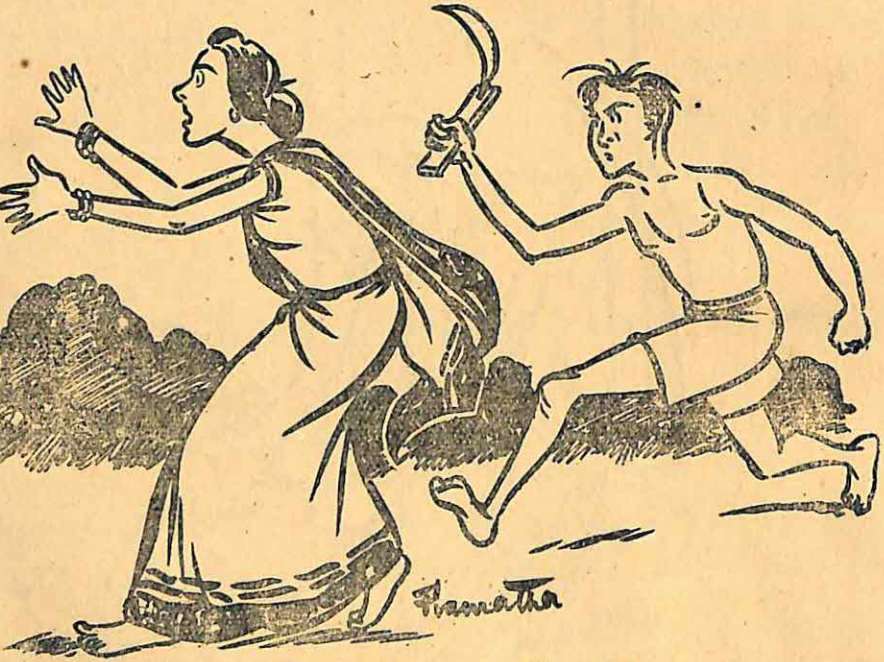


মণ্টু উল্টাইয়া টুল লইয়া পড়িয়া গেল

মণ্টু!

বঁটিহস্তে মণ্টু তখন ক্ষুধায়, ক্রোধে, দুঃখে এবং অপমানে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করিয়া ফোঁপাইতেছে। 'বঁটি রাখ্‌। আমি বলছি বঁটি রাখ্‌ ওখানে।'

মণ্টু বঁটি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। পিসীমা মণ্টুর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কত সব কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার মা শক্ত দেখিয়া একটা পুঁইয়ের ডাঁটা হাতে লইয়া বলিলেন, 'আমি কোন কিছুই শুনতে চাই না। যে ছেলে ঘরের বৌকে বঁটি নিয়ে তাড়া ক'রে পুকুরঘাট পর্য্যন্ত নিয়ে আসে—আমার বাড়ীতে তার স্থান নেই।' তারপর মণ্টুকে বলিলেন, 'এক্ষুণি তুমি আমার



মণ্টু বঁটি লইয়া বৌদিকে তাড়া করিল—পৃঃ ২

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—যে অবস্থায় আছ ঠিক ঐ ভাবে একবস্ত্রে বেরোও। নইলে এই সবগুলো পুঁইয়ের ডাঁটা তোমার পিঠে ভাঙব। কুলাঙ্গার ছেলে—'

মণ্টুর তখনও খাওয়া হয় নাই। সেই সম্বন্ধে পিসীমা কি বলিতে যাইতেছিলেন। মণ্টুর চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তাহার ভয়ানক অভিমান হইল, সে পুকুর ধার দিয়া সোজা রাস্তায় গিয়া নামিল।

অদূরে আম-বাগানের ওপারেই মাঠে খেলা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—মণ্টু সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না,—পিছনেও ফিরিল না। তাহার কেহই নাই। বিশ্বজগতে সে আজ একা, সে আজ পথিক। যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সে আজ চলিয়া যাইবে!

কিছুদূর গিয়াই মণ্টু সমস্বরে চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইল, 'গোল'। ধীরেন, পল্টন, ওদের গলা। 'চীয়ার অফ স্পোর্টিং ক্লাব।'

মণ্টুর ইচ্ছা হইল ছুটিয়া যায় ওখানে—কিন্তু কোন্ মুখ লইয়া সে যাইবে?

নিকটেই সদর রাস্তার পাশে বেশ বড় গোলাকার একটি গাবগাছ ছিল। গাছটা তাহার বিশেষ পরিচিত। সন্ধ্যার আগে দূর হইতে গাছটাকে ঠিক একটা ফুটবলের মত দেখাইত। কেবল একদিকের ছোট একখানা ডাল যেন খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। মণ্টু প্রায়ই ভাবিত, ঐ ডালখানার বাড়তি অংশটা সে কাটিয়া দিবে। মণ্টু সেই গাবগাছে গিয়া উঠিল। কিন্তু ছোট গাছ, সেখানে হইতে খেলার মাঠ ভাল দেখা যায় না। না যাক্, মণ্টু সেই গাছের মধ্যেই বসিয়া থাকিবে। সেখানে তাহাকে কেহই দেখিবে না। মণ্টু গাছের ডালে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—বৌদি, মা, পিসীমা এরা কেহই তাহার আপনার নয়। ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। মণ্টু কল্পনা করিয়া লইল, সে যেন আর কোথায়ও জন্মিয়াছে। তার মা, স্নেহময়ী মা হয়ত আর কেহ আছেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে। বৌদি, পিসীমা এঁরাও তাহার আপনার নয়। হয়ত আপনার বলিতে তাহার কেহই নাই। মণ্টুর দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মুখের খাবার রান্নাঘরে চাপা দেওয়া আছে, অথচ তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! দুঃখে মণ্টুর বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। সে বাড়ী ফিরিবে না, রাত্রেও না! সেই খাবার চাপা দেওয়া থাকিবে—মা দেখিবে, বৌদি নাড়িয়া চাড়িয়া, আবার সে আসিবে বলিয়া ঢাকিয়া রাখিবেন; কিন্তু মণ্টু আসিবে না। দাদা রাত্রে খাইতে বসিয়া মণ্টুর কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। সে নাই—মণ্টুর খাবার ঢাকা পড়িয়া

আছে; কিন্তু সে নাই! বেশ হইবে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উহারা বসিয়া থাকিবে—কিন্তু কোথায় মণ্টু? মণ্টুর বিছানা আজ শূন্য পড়িয়া থাকিবে।



মা বাহিরে আসিয়া দেখিবেন—আকাশের তারাগুলি জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে,

চারিদিক্ নিস্তব্ধ কিন্তু ঘরে বা বাহিরে কোথাও আজ মন্টুকে পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ফুটবল খেলাও শেষ হইয়া গিয়াছে। তুই-একজন পরিচিত লোকও সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল। মন্টুর ইচ্ছা হইতেছিল সে জিজ্ঞাসা করে, খেলায় কোন্ পক্ষের জিৎ হইল।

নিঃসঙ্গ গাবগাছের আশ্রয়। মন্টুর কথা বলিতেও যেন গলা আটকাইয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার ছায়া গাবগাছের ঘন পল্লবের মধ্যে যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কেহ কোথায়ও নাই দেখিয়া মন্টুর ইচ্ছা হইল একবার কথা বলিয়া দেখে, সে কথা বলিতে কেন পারিতেছে না। 'শঁচীন দাঁ, খেঁলায় কঁ গোল হ'ল ?' নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই গাবগাছের মধ্যে মন্টুর কণ্ঠস্বর বড় তুর্ব্বল, যেন নাকিসুরে অন্য কেহ কথা বলিতেছে! মন্টু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই ভয় পাইল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, গাবগাছ আর শেওড়া গাছেই ত' ভূত থাকে!

কয়েকটা বাতুড় গাছের উপর পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। মন্টু মনে মনে তিনবার ভূতের মন্ত্রটা পড়িয়া লইল।

'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছেন ক'রবে আমার কি ?'

'রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছেন'—মনে করিয়া মন্টু সেই অন্ধকার রাত্রে গাব-গাছের ডালের মধ্যে অনেকটা নির্ভর-চিত্তে বসিয়া রহিল।

পল্লীগ্রামের রাস্তা। একে একে লোক-চলাচল বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, কেতু ঘরামি, ভগবান মণ্ডল ইহারা সব লণ্ঠন হাতে করিয়া মন্টুর খোঁজ করিতে বাহির হইয়াছে। উহারা যখন গাবগাছটার নীচে দিয়া যাইতেছিল, তখন মন্টুর ইচ্ছা হইল একবার নাকিসুরে বলে, 'তোঁমরা কোঁথায় যাঁচ্ছ ?' কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে মন্টু কোন সাড়া-শব্দ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মন্টু ভাবিতেছে এবার কেহ আসিয়া ডাকিলেই সে উত্তর দিবে ; কিন্তু বাড়ী যাইবে না।

কিন্তু লণ্ঠন লইয়া ও আবার একটা কে আসে! মণ্টু চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। লোকটি সেই গাবগাছের গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা কাপড়ের পুটলী, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরিধানে গেরুয়া কাপড়। লোকটি একে একে তাহার চুল, দাড়ি সমস্ত খুলিয়া ফেলিল। ও হরি! এ যে আমাদের অভয় দুলে! অভয় দুলে এই সময়ে সাত দিন বহুরূপী সাজিয়া গৃহস্থদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া বেড়ায়।

অভয় দুলে তাহার সন্ন্যাসীর চুল ছাড়িয়া উড়ে ঠাকুরের বেশ পরিল। মণ্টু গাছে বসিয়া সব দেখিতেছিল। অভয় সন্ন্যাসীর সাজগুলি পোঁটলা বাঁধিয়া লইয়া গাছে উঠিল। মণ্টু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল,—যেন নিঃশ্বাস-শব্দও তাহার না শোনা যায়।

মণ্টু খালি গায়ে কেবলমাত্র একটা কালো রংএর হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়া বসিয়াছিল বলিয়া গাবগাছের অন্ধকারে তাহাকে দেখিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

অভয় দুলে তার সন্ন্যাসীর সাজ ও ত্রিশূল গাবগাছের একটা ডালে বাঁধিয়া রাখিয়া নামিয়া গেল। মণ্টুও যেন হাফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অভয় দুলের বাড়ী তাদের গ্রামে নয়, অন্য গ্রামে। কিন্তু এ গাঁয়ের সবাই তাহাকে চেনে। অভয় একদিনে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন সাজের 'বহুরূপী' দেখায়। অভয় দুলে সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্যাসী সাজিয়া লালু পুরুতের বাড়ী হইতে এক পোঁটলা চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, যে বলিবে তাহাকেই সকলে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। কারণ ওপাড়ার লালু পুরুতকে সকলেই চেনে। কৃপণ বলিয়া তাহার একটা ভয়ানক দুর্নামও আছে। এইজন্য সকালে উঠিয়া কেহ বড় একটা তাহার নাম করে না। লালু পুরুতের নামে প্রবাদ আছে, কে একজন, উননে ভাত চড়ান হইলে মনে করিল, 'এখন আর আমার আহার বন্ধ করে কে?' সে লালু পুরুতের গুণ ব্যাখ্যা করিতে বসিল, আর অমনি উননের উপর ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া চৌচির!

লালু পুরুত কেবল যে কৃপণ তাহা নহে, চালাকও খুব।

একবার তাহার স্ত্রী, 'গুপ্তধনের' ব্রত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গুপ্তধনের ব্রত কি, তোমরা হয়ত জান না। এই ব্রত মেয়েরা করেন। চারি বৎসর পালন করিতে হয়। প্রথম বৎসর বৈশাখের প্রথম দিনে মোণ্ডা কি রসগোল্লার মধ্যে লুকাইয়া একটা রূপার দুয়ানি রাখিয়া উহা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসর ঐরূপভাবে একটা রূপার সিকি, তৃতীয় বৎসর আধুলি এবং চতুর্থ বৎসর একটা টাকা দিয়া ঐ ব্রত শেষ করিবার নিয়ম। এই ব্রত যিনি করেন, পরজন্মে তিনি ঐ গুপ্তধনের দশ হাজার গুণ ফিরে পান।

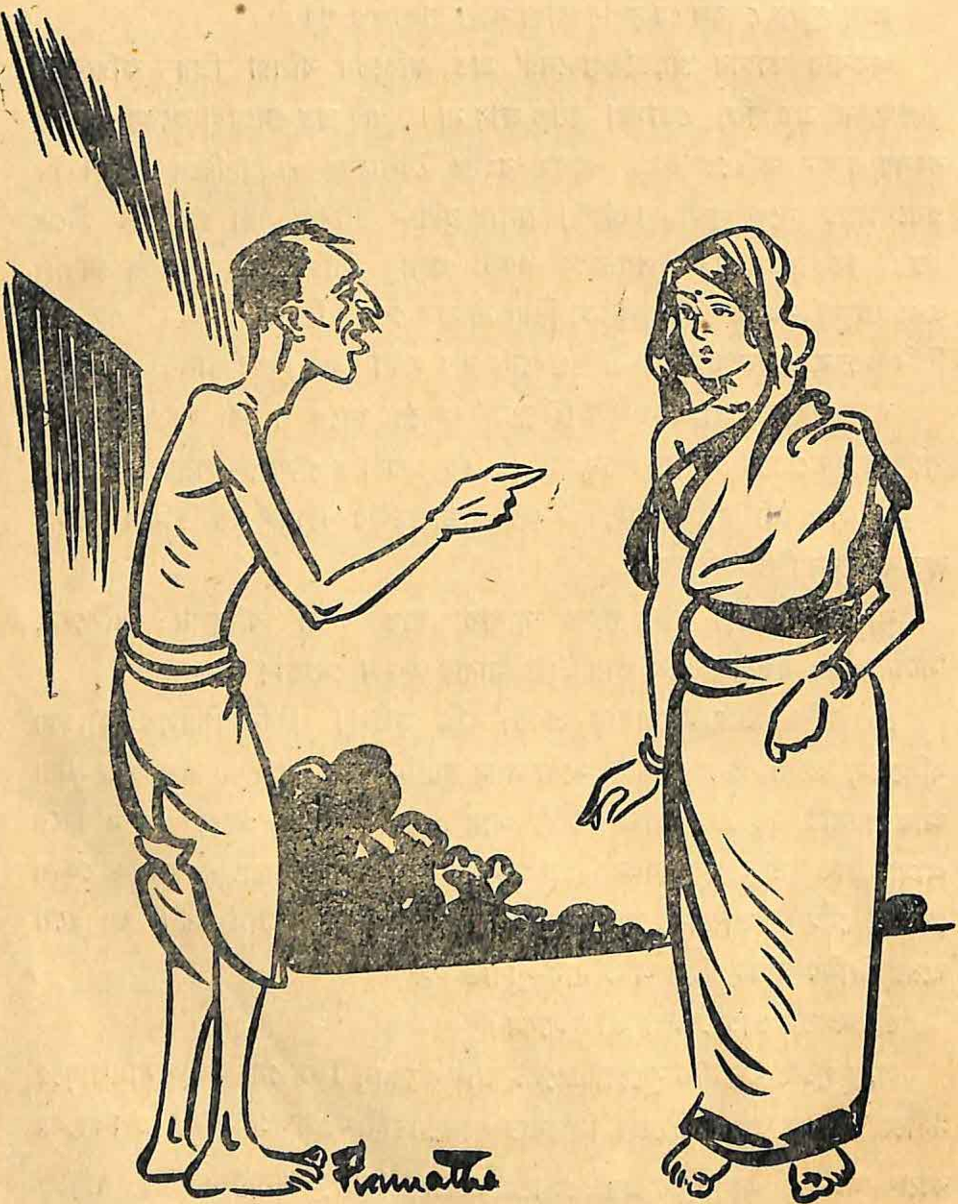
লালু পুরুতের স্ত্রী একজন 'ফার্ষ্ট ক্লাস' কৃপণের হাতে পড়িয়া সারাটা জীবন পয়সার মুখ চোখে দেখিতে পান নাই। এই জন্মটা ত গেলই,—পরজন্মে যাহাতে কিছু টাকা-পয়সা হাতে পান, এই জন্য পাড়াপড়শীর পরামর্শ মত তিনি গুপ্তধনের ব্রত করিবেন স্থির করিলেন।

সবিশেষ শুনিয়া লালু পুরুত মাথায় হাত দিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! একটা দুয়ানি, তার উপর আবার একটা মোণ্ডা!'

চট করিয়া তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি জুটিল। তিনি গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো শুনছ, মিষ্টির মধ্যে যখন দুয়ানি দিতে হয় তখন এক কাজ কর। আধ পয়সার গুড় এনে দিচ্ছি—সেই আধ পয়সার গুড়ের মধ্যে দুয়ানি দিয়ে আমায় দাও—ব্রাহ্মণকে যখন দিতে হয় এবং আমিও যখন ব্রাহ্মণ, তখন ত কোন গোলই নেই! তারপর সেই গুড় দিয়ে কচি আমের চাটনি কর। তা' হলে ঘরের জিনিষ ঘরেই রইল অথচ দান-পুণ্যিও হল!'

স্ত্রী অগত্যা তাহাতেই রাজী হইলেন।

লালু পুরুত বারমাস কূয়োর জলেই স্নান করেন; কিন্তু সেদিন দুই মাইল দূরে নদীতে গেলেন স্নান করিতে। ফিরিবার পথে নিতাই ময়রার দোকান। দোকানের কাছে আসিয়া লালু পুরোহিত জোরে জোরে—'জবাকুসুমসঙ্কাশং' মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।



সেই গুড় দিয়ে কচি আমের চাটনি কর।

‘বাবা নিত্যধন !’

নিতাই ময়রা ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া প্রাতঃপ্রণাম জানাইল, ‘ঠাকুর মশাই, এই রোদের মধ্যে আজ এতদূরে গঙ্গাস্নানে এলেন !’

‘সেই কথাই বলছি বাবা। বারমাস ত’ কূয়োতেই স্নান করি, কিন্তু আজ একটা দিন। পণ্ডিত জনার্দ্দন বলেছেন, বৈশাখস্ত প্রথমে দিনে--আজকেই ত’ দানপুণ্য করবার দিন। বলি, সংসারে ত’ সবই পড়ে থাকবে—সঙ্গে যাবে কেবল ঐটুকু, যা ফাঁকতালে ক’রে নিতে পার।’

‘শ্রী গোবিন্দ’—লালু মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনবার তুড়ি মারিলেন। ‘তা’ দেখ, নদী থেকে স্নান ক’রে রৌদ্রের মধ্যে এতটা পথ হেঁটে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। এক গ্লাস জল যদি দিতে বাবা !’

নিতাই ময়রা তাড়াতাড়ি খানিকটা গুড় আর এক গ্লাস জল আনিয়া দিল।

‘উপবাসী আছি— গুড় খাব না নিতাই। কিন্তু আজকের দিনে যখন ভক্তি ক’রে তুমি হাতে ক’রে ওটা এনেছ তখন ফেলতেও ত’ পারব না।’

নিতাই সভক্তিহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছু দূর গিয়া লালু পুরুত আবার ফিরিলেন, ‘নিত্যধন, একটা কথা বলি বাবা। বাড়ীতে আজ গুপ্তধনের ব্রত। রূপোর দুয়ানি চাই। কিন্তু রূপো কি আর দেশে আছে ! এখন সব মেকী চলছে। রূপোর দুয়ানি থাকে ত’ একটা দাও না বাবা ! আবার বিকেলেই তোমাকে তার বদলে আর একটা দুয়ানি দিয়ে যাব। দ্যাখো, এই সব ধর্ম্মকাজে সাহায্য করাও পুণ্যি।’

নিতাই তাহার হাতবাক্স খুলিয়া একটা রূপোর ক্ষুদ্র দুয়ানি দিয়া দিল।

কিন্তু সেই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আরও এক মাইল পথ হাঁটিয়া পুরুত ঠাকুর গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িলেন। বাড়ী ফিরিয়া গুড় ও দুয়ানি রাখিয়া লালু রায়পাড়ার পুকুরে আবার তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেলেন। রায়েদের পুকুর-পাড়ের কলমের বাগানে অনেক কচি আম হইয়াছে।

এদিকে লালু পুরুতের স্ত্রীকে পাড়ার পাঁচজনে পরামর্শ দিল, 'সে কি হয়! ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ব্রত-আচার এসব কি ঘরাঘরির ব্যাপার! ঘরের জিনিষ যদি ঘরেই রইল তা'হলে আর 'দান' হল কি?'

স্ত্রী বুঝিলেন, ইহা খুবই সঙ্গত কথা। দান মানেই ত' স্বত্বত্যাগ করিয়া দেওয়া। দানকরা গুড় দিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাইলে স্বত্বত্যাগ হইবে কিরূপে?

সুতরাং, লালু পুরুত দ্বিতীয়বার স্নান করিয়া আমের গুটি লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই তিনি উহা পাড়ার অপর এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলিলেন!

পুরুত ঠাকুর স্নান করিয়া আসিয়া যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাহার মনের যে অবস্থা হইল, মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াও রাবণের অবস্থা তত খারাপ হয় নাই!

এত আটঘাট বাঁধিয়াও তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল! নিতাই ময়রাকে ঘর হইতে কড়কড়ে আটটি পয়সা বাহির করিয়া দিতে হইবে। উঃ। লালু পুরুতের মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করিল। ষড়যন্ত্র। দারুণ ষড়যন্ত্র! পাড়াপড়শীরা সব ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে পথে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে! লালু মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

কিন্তু দুপুরবেলায় এভাবে বসিয়া কাঁদিলে লাভ কিছু নাই বরং উহাতে ক্ষুধার উদ্রেক বেশী হওয়ায় সেও একটা খরচ!

সুতরাং লালু পুরুত একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া ফেলিলেন।

এখন হইতে প্রত্যহ রাঁধিবার চাউল হইতে লালু একমুষ্টি করিয়া তুলিয়া রাখেন। স্ত্রী এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'দেখ, শাস্ত্রে লেখে দান-ধর্ম্মের মত পুণ্য আর নেই—প্রত্যহ কিছু দান করা উচিত। কিন্তু দানের পাত্র চাই। যে সব ভিখারী-বৈষ্ণব ভিক্ষা নিতে আসে, ওরা সব জোচ্চোর। সুতরাং মনে ক'রেছি নিজেদের দৈনিক খরচ থেকে ঐ চালটা তুলে একজায়গায় জমা ক'রে একটা ভালো সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসীকে দিয়ে আসব।

বলাবাহুল্য, ভিখারী, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল-দুঃখীকে ভিক্ষা দেওয়া লালুর কড়া নিষেধ ছিল এবং সেই জন্য কোনও ভিক্ষুক তাঁহার বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াইত না।

সেদিন সন্ধ্যারাত্রে লালু বাড়ী নাই, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া 'ভিক্ষা দাও' বলিয়া উপস্থিত।

লালুর স্ত্রী বহুকাল পরে বাড়ীতে ভিক্ষাপ্রার্থী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভাবিলেন, ভগবানের অনুগ্রহ। ভিক্ষার চাউল এবং সন্ন্যাসী দুই-ই উপস্থিত। সুতরাং এ যোগাযোগ ছাড়া যায় না। তিনি লালুর প্রত্যহ সযত্নে সংরক্ষিত চাউলগুলি সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ঢালিয়া দিলেন।

কিন্তু পুরুতের স্ত্রী জানিতেন না যে, এই সন্ন্যাসী আর কেহ নয়—আমাদের সেই বহুরূপী অভয় দুলে।

সন্ন্যাসী আসিয়া চাউলগুলি লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, লালুর ফিট হইবার উপক্রম হইল। আজ একমাস সে নিতাই ময়রাকে সেই দু' আনার পয়সার জন্য ঘুরাইতেছে—সে পথ দিয়া তাহার হাঁটাই মুস্কিল। প্রায় সের দুই চাউল হইয়াছিল। লালুর বড় আশা ঐ চাউলগুলি বিক্রয় করিয়া কালই তাহার দেনা মিটাইয়া আসিবে; কিন্তু হঠাৎ ধূমকেতুর মত এ সন্ন্যাসী আসিয়া জুটিল কোথা হইতে!

ষড়যন্ত্র, এও ষড়যন্ত্র এবং তাহাকে পথে বসাইবার মতলব! লালু মাটিতে পড়িয়াছিল—উঠিয়া বসিল, 'না, কিছুতেই এ অত্যাচার সহ্য করব না। তন্ন তন্ন ক'রে সেই সন্ন্যাসীকে খুঁজে বার করতে হবে।'

লালু পাগলের মত সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে বাহির হইল—'তার ঝুলি ঝেড়ে যদি সে-চাল না নিয়ে আসতে পারি ত' আমার নাম লালু পুরুতই নয়।'

মণ্টু বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সন্ন্যাসী সাজিয়া দূরে চলিয়া যাওয়া মন্দ নয়। লোকে যত সব ভাল ভাল খাবার দিবে। কত যত্ন করিবে!

সন্ন্যাসীর কথায় মণ্টুর হরিদ্বারের কথা মনে পড়িল। হরিদ্বার সে যায় নাই,

কিন্তু তাহার পিসীমার কাছে এতবার সেখানকার গল্প শুনিয়াছে যে, সেখানকার ছবি যেন তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। হরিদ্বার ছাড়িয়া হৃষিকেশ, তারপর লছমণঝোলা। লছমণঝোলার 'হ্যাঙ্গিং ব্রীজ্' পার হইয়া বদ্‌রীনারায়ণের পথে উঠিতে হয়। ডানদিকে গঙ্গার পাড়ে কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা। গঙ্গার পাড়ে পাহাড়ের এখানে সেখানে শত শত সন্ন্যাসীর আশ্রম। ধর্ম্মশালা হইতে এই সব সন্ন্যাসীদের প্রত্যহ ডাল-রুটি দেওয়া হয়।

ডাল-রুটির কথা ভাবিতেই মণ্টুর পেটের ক্ষুধা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পেটে ক্ষুধা থাকিলে বুদ্ধিও ভাল খেলে। মণ্টুর মাথায়ও চট্ করিয়া একটা মতলব জুটিল। সে অভয় দুলের সন্ন্যাসীর সাজটা খুলিয়া লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। তারপর রংএর পুট্‌লী খুলিয়া সাদা রং মাখিয়া এবং মুখে দাড়ি ও মাথায় জটা লইয়া 'জয় বাবা বদ্‌রীনারায়ণ কী জয়' বলিয়া রাস্তা ধরিয়া রওনা দিল।

রাত্রি আন্দাজ দশটা হইবে, কিন্তু গ্রীষ্মকাল বলিয়া সকলেই জাগিয়া আছেন—মণ্টু জানিত তাহার মা এবং বৌদি সেইদিন রায়বাড়ী তাঁর মামীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। সুতরাং এইবার নির্ভয়ে সে সদর দরজা দিয়া সোজা নিজেদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেই, পিসীমা উঠিয়া বসিলেন, তিনি রোয়াকের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিলেন। মণ্টুকে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—'কে রে ?'

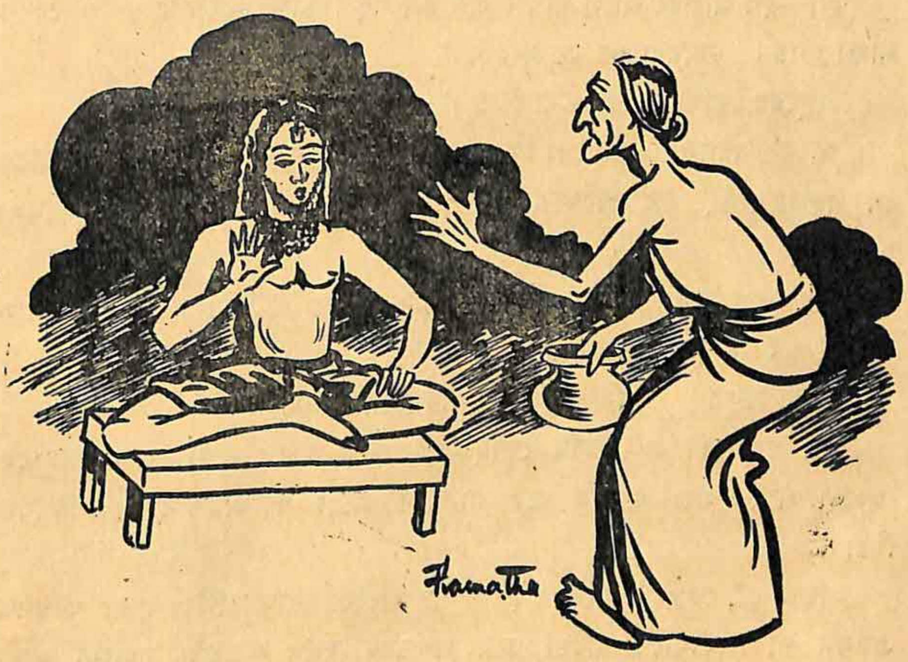
'ভো সন্ন্যাসী অহম্।' সত্যই ত একজন তরুণ সন্ন্যাসী !

তাড়াতাড়ি পিসীমা আঁচল দিয়া একখানা চৌকী মুছিয়া সন্ন্যাসীকে বসিতে বলিলেন।

'নাহং বসামি। ক্ষুধার্ত্ত অহম্।' মণ্টু জানিত তাহার পিসীমা সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাকে দেবতার অবতার মনে করিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। মণ্টুর কাছে তাহার পিসীমা একদিন গল্প করিয়াছিলেন,—অতিথি, ব্রাহ্মণ আর সন্ন্যাসী আসিয়া আসন গ্রহণ না করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। সে-কথা মণ্টুর মনে ছিল। তাই সে পিসীমাকে গম্ভীর গলায় বলিল, 'নাহং বসামি'।

শেষে পিসীমার বিশেষ অনুরোধে মণ্টু আসন গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু যেই তিনি একঘটি জল আনিয়া মণ্টুর পা ধোয়াইতে গেল তখনই সে হাত নাড়িয়া বলিল—'অগ্রে নব কলমবৃক্ষস্থ আম্রং দাও, পরে পদপ্রক্ষালনং করিষ্যামি।'

কি আশ্চর্য্য ! নূতন কলমের গাছে আম ফলিয়াছে এবং তাহা ঘরে আছে সন্ন্যাসী তাহা কিরূপে জানিল !



পিসীমা তাড়াতাড়ি একবাটি ছুধ ও নূতন কলমের গাছের একটা বোম্বাই আম আনিয়া সন্ন্যাসীকে দিলেন।

'আরে স্বার্থপর মানুষ, বড় আম ঘরে রাখিয়া ছোট আম সন্ন্যাসীকে দেয়ং।' —সন্ন্যাসী ঢক্ ঢক্ করিয়া ছুধটুকু খাইয়া ফেলিল।

পিসীমা ঘরে গিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ ! তাই ত', মণ্টু যে বড় আমটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কে জানিত !

'ঠাকুর ঘাট হ'য়েছে—অপরাধ নিও না। আমাদের পাগলা দুরন্ত ছেলে মণ্টু একপাশে সরিয়ে রেখেছিল।'

'আচ্ছা রাখ্ দাও। মণ্টু বাড়ী আয়া ত ওভি আম খায়ে গা।' মণ্টু গম্ভীর গলায় বলিল।

পিসীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'ঠাকুর সে কি আসবে ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ আলবৎ আসে গা। রাগ কম পড় গিয়া ও আসে গা। ও ছেলে আচ্ছা হ্যায়। তোমরা ওর যত্ন করিবে।'

'ঠাকুরের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?'

'আরে—সন্ন্যাসী লোক কো কি আস্তানা ঠিক হ্যায় ? হাম ভি বদরীনারায়ণ সে লছমণঝোলা, ঔর হরিদ্বার, তারপর হৃষিকেশ আওর প্রয়াগমে কুম্ভমেলা হ্যায় না ?'

কুম্ভমেলার কথা শুনিয়া পিসীমার মন নাচিয়া উঠিল। এই কয়েকমাস আগেই ত তিনি কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেন।

'হাঁ হাঁ ঠাকুর ! আমিও ত কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেম।'

'হ্যা হ্যা বুড়ী মাই, হাম তোম্‌লোক দেখা হায়। তোমার কপাল ছে একটো পট্টি,—এক আদমি ধরে গা তো প্রয়াগ কা অক্ষয় বটসে দর্শন মিল গিয়া।'

সত্যিই ত', ফোর্টের কাছে পড়িয়া গিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া যায়। তারপর একজন পাণ্ডা তাঁহাকে ধরিয়া তবে অক্ষয়বট দর্শন করায়। সন্ন্যাসী তাহা কিরূপে জানিল !

সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিল—'তোমলোক হরিদ্বার ছে বহুৎ মছলী দেখে গা—তাদের ছোলা দেতা হ্যায়,—ঔর ব্রহ্মকুণ্ড মে পয়সা দেতা হ্যায়, গোলাপ ফুল দেতা হায় !'

পিসীমা তন্ময় হইয়া সন্ন্যাসীর এই সব কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইনি নিশ্চয় কোন দেবতা,— মানুষের ছল করিয়া আসিয়াছেন !'

পিসীমা অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন সন্ন্যাসী বলিতেছে,—'ঔর লছমন ঝোলা মন্দিরকা খাতামে তোর নাম লেখায়ে এক রূপেয়া দেতা হ্যায়। থোড়াপর স্বরগ দ্বারসে খেয়া নৌকায় এপার আসতা হ্যায়, উসকো খেয়ামে পয়সা নাহি লাগতা হ্যায়—'

'সন্ন্যাসী, শীগ্‌গির আমার চাল দাও'—ঝড়ের মতন লালু পুরুত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

'কেয়া ?'

'রাত্তির বেলায় বাড়ীর মেয়েছেলের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে চাল আনা তোমায় আমি দেখাচ্ছি !—তোমায় আমি পুলিশে দেবো !'

পুলিশে দেওয়ার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর তখন সন্ন্যাসী হওয়ার আর সাধ নাই। এইরূপ আকস্মিকভাবে লালু পুরুত আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে ইহা নবীন সন্ন্যাসী মণ্টু ভাবিতেও পারে নাই।

অভয় ঢুলে ইতিমধ্যে গাবগাছে তাহার সন্ন্যাসীর সাজ না পাইয়া খোঁজ করিতে করিতে একেবারে মণ্টুদের বাড়ী আসিয়া হাজির।

'মা ঠাকুরাণ, আমি উড়ে নই—অভয় ঢুলে। বহুরূপীর সাজে উড়ে সেজেছি। একজন সন্ন্যাসী এখানে এসেছেন ?' বলিতে বলিতে সে রোয়াকের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

'কি বলছ তোমরা বুঝতে পারছি না'—পিসিমা বলিলেন। 'কি দেখছ তুমি লালু ? ইনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি হরিদ্বার প্রয়াগ কোথায় কোন সময়ে গিয়েছিলাম, এই সন্ন্যাসী সব ঠিক ঠিক ব'লে দিলেন।'

লালুরও মনে পড়িল চাউলগুলি সে একজন ভাল সন্ন্যাসীকে দিবে এই কথা তাহার স্ত্রীকে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল,—দেবতা কি তবে ছল ধরিবার জন্য আসিলেন ! অন্তরীক্ষ হইতে সত্যই কি কেহ মানুষের কথা শুনিতে পায় ? এই জন্যই চালাকি করিয়াও মিথ্যা বলিতে নাই। লালুর সত্যনারায়ণের কথা মনে পড়িল—

'সদাগরে ডাকি কহে সাধুর তনয়,
ডিঙ্গায় কি আছে তব কহ মহাশয়।
সদাগর বলে মোর ডিঙ্গার ভিতরে
লতা আর পাতা সব আছে থরে থরে !
নিশা অবসান হ'লে করি হায় হায়
সদাগর কাঁদি বলে কি হবে উপায় !
নৌকার বেসাতি যত রেশম পশম
লতা পাতা হ'য়ে গেছে সাধুর কারণ !'

যজমান বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা করিতে গিয়া লালু এই পুঁথি পড়িয়া থাকে। তাহার নিজের জীবনেও যে এই রকম মিথ্যার ফল ফলিতে পারে সে তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

লালুর কেমন ভয় হইল ; বলিল, 'বাবা, আমার অপরাধ নিও না।'

'তুমি বড় কৃপণ আছ। তোমার টাকা আছে, কিন্তু তুমি তোমার স্ত্রীকে বড় কষ্ট দাও।'

এর চেয়ে বড় সত্য কথা আর কিছু থাকিতে পারে? লালু করযোড়ে কহিল, 'আমি কক্ষণও আর তাকে কষ্ট দেব না। তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর ঠাকুর !'

কথাবার্ত্তা শুনিয়া অভয় দুলেরও কেমন ভাবাবেশ হইয়াছিল। সে হাতজোড় করিয়া বসিয়া পড়িল।

সাধু গম্ভীর গলায় বলিলেন, 'তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। সকলেই চোখ বুঁজে আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুখের মধ্যে দিয়ে কার কি প্রার্থনা চিন্তা কর। সাবধান, কে কি চাও পরিষ্কার ক'রে যতক্ষণ ভাবতে না পারবে, ততক্ষণ চোখ মেলবে না—বা কথা বলবে না।'

পিসীমা, লালু পুরুত এবং অভয় দুলে সেই রোয়াকের উপর চোখ বুঁজিয়া নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া পড়িল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মণ্টুর মা ও বৌদি ফিরিলেন। উহারা তখনও চোখ বুঁজিয়া বসিয়া আছেন। মণ্টুর মা অনেক কষ্টে উহাদের কথা বলাইয়া সবিশেষ শুনিলেন।

পিসীমা বলিলেন, 'তাইত, একি তবে স্বপ্ন দেখিলাম ?'

অভয় ছুলে দেখিল, তাহার সন্ন্যাসীর সাজ সেইখানেই রহিয়াছে, লালু পুরুতের চা'ল তাহার কোলের কাছে পুটলীতে পড়িয়া আছে। পিসীমা দেখিলেন, মণ্টু তাহার বিছানার যথাস্থানে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে! সত্যই ত!—সকলের মনোবাঞ্ছাই ত পূর্ণ হইয়াছে।

এই কথা লইয়া গ্রামের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কেহ বলিলেন, ডাকাত পড়িবে তাই পূর্ব্বে সন্ন্যাসী সাজিয়া সব জানিয়া গেল। কেহ বলিলেন, ভৌতিক ব্যাপার। কেহ বলিলেন, ভগবান ছল করিয়া আসিয়াছিলেন—অমন মধ্যে মধ্যে তিনি আসেনও।

মণ্টুর গায়ে যে কোথাও কোথাও ছাইয়ের চিহ্ন ছিল তাহা একমাত্র মণ্টুর বৌদি ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

সেদিন খেলিবার মাঠ হইতে মণ্টু আর বাড়ী ফিরিল না।

অভিমন্যুকে যেমন একদিন অষ্টরথীতে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, মণ্টুর বিরুদ্ধেও আজ তেমনি পর পর অনেকগুলি নালিশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মণ্টুর বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই,—ইস্কুলে যাইবারও মুখ নাই।

সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া ঘুম হইতে উঠিয়াছিল কে জানে।

খেলিবার মাঠে উপস্থিত হইয়াই মণ্টু জানিতে পারিল, সেদিন রাত্রে "গাঁজা ও আফিংএর দোকানের" বিজ্ঞাপন লইয়া কে জ্যোতিষার্ণব পণ্ডিত গজপতি বিদ্যাচঞ্চুর দরজায় লাগাইয়া দিয়াছিল এবং গজপতি পণ্ডিতের "এখানে হস্তরেখা ও ভাগ্য গণনা করা হয়" বিজ্ঞাপনটি ইস্কুলের গেটের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে!

খেলা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হাবুল আসিয়া সংবাদ দিল, মণ্টুর বাবা তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া মণ্টুর জাপানী মুখস, তীর-ধনুক, লাঠি, ম্যাজিক এবং ছদ্মবেশের বহুবিধ সাজসরঞ্জাম বাহির করিয়া পড়াশুনার বদলে এই সব করা হয় বলিয়া খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন।

ইতিমধ্যে স্কুলের দপ্তরী নবিরুদ্দিন আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, সারদাবাবু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া মণ্টুর নামে অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং আগামী কাল তাহার বিচার হইবে।

এই সারদাবাবু লোকটির কিছু ইতিহাস আছে এবং তাঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তিনি বদরাগী।

সারদাবাবু বারমাস মোজা, গরম কোট আর মাফলার ব্যবহার করেন। সারদাবাবুকে কেহই কোনদিন স্নান করিতে দেখে নাই। এ বিষয়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যাহারা স্নান করে

তাহাদের চেয়ে যাহারা স্নান করে না তাহার সংখ্যা বিশ হাজারগুণ বেশী। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিলে তিনি নজির দেখাইয়া দেন, গ্রীণল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এই সব 'ল্যাণ্ডের' দেশের লোক স্নান করে না, কাবুলিরা স্নান করে না এবং তিব্বতের লোকে জলস্পর্শও করে না।

শ্রীযুক্ত সারদাবাবু বারমাস একটিমাত্র কোট ব্যবহার করেন। দুষ্ট ছেলেরা বলাবলি করে,—কোটটি সারদাবাবুর বাবার আমলের। পৈত্রিকস্বত্ব হিসাবে অন্যান্য জিনিষের সহিত কোটটিও তিনি দখল করিয়া আসিতেছেন!

সারদাবাবুর মাথায় ছোট্ট একটি 'টাক' আছে (সংবাদটি খুব গোপনীয়)। এই টাকের জন্য তিনি একসঙ্গে হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, বায়ওক্যামিক, কবিরাজী ও হেকিমী মতে চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল পাননি। কিন্তু টাকটিকে মাথার চারিপাশের চুল দিয়া তিনি এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখেন যে, হঠাৎ কাহারও তাহা নজরে পড়ে না।

সারদাবাবু ইস্কুলের মাষ্টার।

যে কথা হইতেছিল! মণ্টুর উপর সারদাবাবু ভয়ানক চটা ; কারণ একদিন সে সারদাবাবুকে টাকের ইংরিজি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতেই দেখা গেল, দেশ-বিদেশের ডাক্তারখানা হইতে সারদাবাবুর নামে টাক সম্বন্ধে বহুবিধ চিঠিপত্র আসিতে আরম্ভ করিয়াছে!

সারদাবাবু ঘরে-বাহিরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

এখন 'টাক' অর্থে সারদাবাবুকে বুঝায় এবং 'টাক' কথাটি শুনিলেই সারদাবাবু চটিয়া যান।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলক্রমে রচনার প্রশ্ন বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। ছেলেরা তাহা লইয়া খুব হৈ চৈ আরম্ভ করিল। সারদাবাবু বলিলেন, 'ইচ্ছামত যে কোনও বিষয় লইয়া তোমরা আপন আপন রচনা লিখিতে পার।'

মণ্টুর খাতা খুলিয়া সারদাবাবু দেখিলেন, সে 'টাক' সম্বন্ধে রচনা লিখিয়াছে!

হেডমাষ্টার মহাশয়ও নাকি বলিয়াছেন, 'এখন কেবল হস্তরেখা নয়—এখন হইতে জামা খুলিয়া পিঠের বেত্ররেখাও গণনা করা হইবে।' সুতরাং পরদিন সকালে ইস্কুলে যাওয়া কিছুমাত্র নিরাপদ নয়।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া খেলিবার মাঠ হইতেই মণ্টু গা ঢাকা দিল। তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রা। দু'চোখ যেদিকে যায়।

কোথায় যাইতে হইবে মণ্টু তাহা জানে না। সে এইমাত্র জানে যে, সে আর বাড়ী ফিরিবে না,—ইস্কুলে যাইবে না এবং সারদা পণ্ডিতের নিকটও আর পড়িবে না।

মণ্টু যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। হাফ-প্যাণ্ট পরা, গায়ে জারসি—গলায় রুমালটা নেকটাইয়ের মত গিট দিয়া বাঁধা, ডান হাতে হুইসেল বাঁশী, বাঁ হাতে বুকের সঙ্গে জাপটাইয়া ধরা ফুটবল—'ইনডিপেনডেণ্ট ইলেভন্ ক্লাবের' ক্যাপ্টেন মণ্টু ব্যানার্জ্জি অজানার পথে বাহির হইল।

হাবুলের উপর মণ্টুর রাগ কম হয় নাই—'ওটা একটা আস্ত ইডিয়ট। বাবা বাড়ীতে এসে ওগুলো ধ'রে ফেলবার আগে তুই বাপু একটু সামলে নিতে পারলিনে!'

কে যেন সাইকেল চড়িয়া বেল দিতে দিতে আসিতেছিল।

'মানুষং ন বিশ্বাসং'—মণ্টু রাস্তার নীচে নামিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

না, ওটা একটা কাবুলী! মণ্টু ভাবিল, এই কাবুলীওয়ালাকে সাইকেল চড়িলে মোটেই মানায় না। মণ্টু রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্প পড়িয়াছিল,—ইয়া লাঠি হাতে, ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, বিরাট বপু!

মণ্টু মনে মনে রহমত কাবুলীওয়ালার সঙ্গে এই ছিটের পাতলা পাজামা-পরা, জাপানী সিল্কের গেঞ্জি গায়ে দেওয়া এবং বাঙ্গালীর মতন দশ আনা ছ' আনা করিয়া চুলছাঁটা—সাইকেল চড়া কাবুলীর তুলনা করিয়া ভাবিল, 'ধ্যেৎ, যদি আর একটু বড় হ'তাম, বেটাকে এক থাপ্পড় মেরে সাইকেলটা নিয়ে একদিকে কেটে ওঠা যেত!'

বড় না হইবার জন্য মণ্টুর দুঃখ হইল। সে আবার রাস্তায় আসিয়া উঠিল। কিন্তু এদিকে ক্ষিদেয় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।

রাস্তার কাছে একটা গৃহস্থ বাড়ী। মণ্টুর ইচ্ছা, হইল কিছু চাহিয়া খায়, —কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি? —নৈব নৈব চ।

রাস্তার পাশে আমগাছটিতে কতগুলি আম পাকিয়া আছে। চট করিয়া মণ্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। সে একটা কিক্ করিয়া ফুটবলটিকে একেবারে গাছের ডালে তুলিয়া দিল। তারপর হুইসেল—বারংবার হুইসেল।



পাড়ার ছোট ছেলেরা ছুটিয়া আসিল। এক বুড়ী বাহির হইয়া বলিল 'কে রে ছোঁড়া তুই?'

মণ্টু বলিল, 'আমি বড়বাবুর ভাগ্নে। বল খেলে ফিরছিলাম—কিন্তু বলটা আটকে গেল ওই আম গাছটার ডালে। শীগগির আমার বল পেড়ে দিতে বলো।'

'বড়বাবু'টা যে কে, তা মণ্টুও জানে না, বুড়িও জানে না; কিন্তু বড়বাবুর ভাগ্নের যখন বল আটকাইয়া গিয়াছে তখন তাহা পাড়িয়া দেওয়া ত দরকারই।

তখনই একটা ছেলে গাছে উঠিল। মণ্টু বড়বাবুর মতন ভাব দেখাইয়া গম্ভীর গলায় বলিল, 'এই ছেলেটা, জোরে ডালটা ধ'রে একটা ঝাঁকি দে দেখি! বলটা তা' হ'লে আপনিই পড়ে যাবে।'

পাকা আমের ডালে জোরে ঝাঁকি দিলে কি হয় তোমরা জান। মণ্টু নীচে হইতে পাকা আম কুড়াইয়া পেট ভরিয়া খাইতে লাগিল।

'আরে ও ডালটায় নয় রে,—ওটা নয়—তোর বাঁ দিকের ওই ডালটায়—হ্যাঁ; খুব জোরে খু—ব—আরও, আরও।'

মণ্টুর তখন আম খাইয়া পেট ভরিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'তোর কর্ম্ম নয়, তুই নাম।'

তারপর রাস্তার উপর হইতে ঢিল কুড়াইয়া লইয়া এক ঢিলে বলটি পাড়িয়া মণ্টু আবার পথ ধরিয়া চলিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, চাষী-বৌরা গোয়ালঘরের সম্মুখে মশা তাড়াইবার জন্য 'সাঁজাল' দিয়াছে। হাঁসগুলি দল বাঁধিয়া হেলিতে দুলিতে বাড়ীর পাশের কলমী-ঘেরা ডোবা হইতে উঠিয়া ঘরে যাইতেছে। কোথায়ও গাঁয়ের ছেলেরা 'হাডু-ডু' খেলিতেছে।

'এঃ! ছেলেটাকে প্রায় ধ'রেছিল আর কি!—অতটুকু ছেলের গায়ে জোর আছে বেশ!'

মণ্টু দাঁড়াইয়া খেলা দেখে। তাহারও খেলায় নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়! 'না!—এদিকে আবার রাত হ'য়ে যাচ্ছে।'

মণ্টু আবার জোরে জোরে পা চালাইয়া দেয়।

সম্মুখে একটা গ্রামের হাটখোলা। প্রকাণ্ড অশথ গাছের নীচে ছোট ছোট টিনের চালা। কয়েকখানা দোকানঘরও আছে। আজ হাটবার নয়। কেরোসিন টিনের আলকাতরা-মাখা ছোট্ট ঘরে বাঁশের মাচানের উপর বসিয়া দোকানদার তাহার হিসাব-পত্র লিখিতেছে। একটা আট-দশ বছরের পেটমোটা রোগা ছেলে দোকানীর পাশে বসিয়া আপ্রাণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া পড়িতেছে, 'গোপাল বড় ভাল ছেলে। সে যা' পায় তাই খায়, যা' পায় তাই পরে।'

বইয়ের এই গোপাল নামক ছেলেটিকে মণ্টুর পছন্দ হইল না। গোপাল যেন ঐ দোকানির ছেলেটার মতই একটা টিমটিমে, সর্ব্বাঙ্গে তাবিজ-কবচে বোঝাই ম্যালেরিয়া রোগী! গায়ে জোর নাই, খেলা-ধূলায় উৎসাহ নাই, কেবল পড়া আর পড়া!

মণ্টু অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে লাগিল। হাটখোলা ছাড়িয়া জেলেপাড়া—তারপর একটা খেয়া ঘাট। এপারে নৌকা থাকিলে মণ্টু নিজেই দাঁড় ঠেলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু নৌকা ওপারে এবং এপারে আসিবার যাত্রী কেহই নাই।

মণ্টু গাঁয়ের রাস্তা ধরিয়া চলিল। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠিয়াছে; দূরের ঝোপগুলাকে যেন ভূতের মতন বলিয়া মনে হয়। মণ্টু ভাবিল, নিকটে কোনও বাড়ীতে রাত্তিরটার জন্য আশ্রয় নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহাকে যে সকলে মিলিয়া—'বাড়ী কোথা, কা'র ছেলে, কোথা যাবে, কেন যাবে' এই সব উকিলের জেরা আরম্ভ করিবে, এইটাই তাহার অসহ্য। তার চেয়ে রাস্তাই ভাল।

গ্রামের পথ। অচেনা মানুষ দেখিলেই এখানকার কুকুরগুলো বড্ড ঘেউ ঘেউ করে। মণ্টু ভাবিল, তাহার লাঠিখানা যদি সঙ্গে করিয়া আনিত, তাহা হইলে দুই-একটা প্যাঁচ দেখাইয়া দিলেই যাদুরা বুঝিতেন—হ্যাঁ, এ মণ্টু ব্যানার্জ্জি! পথ আগলে ঘেউ ঘেউ করা এর কাছে চলিবে না!

কিছুদূর গিয়া মণ্টু দেখিল, রাস্তার পাশেই বেশ বড় একখানা টিনের বারোয়ারী ঠাকুর-ঘর। এখানে মাটি দিয়া কত সব মহাভারতের ছবি তৈরী করা হইয়াছে। ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর অপমান, যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা

এই সব। ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ এবং ভীষ্মকে মণ্টুর খুব ভাল লাগিল। দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া মণ্টুর শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করে—হাঁ গুরু বটে! কিন্তু একলব্যের আঙ্গুল কাটা ব্যাপারটা মণ্টুর মনে কেমন খোঁচা দেয়।

মণ্টু ভীষ্মের পায়ের কাছে গিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিল!—বীর এই পিতামহ ভীষ্ম! যে কথা সেই কাজ।

মণ্টু ভাবিল, সে-রাত্রিটা এই বারোয়ারী ঠাকুরের ঘরে শুইয়া থাকিবে। চারিদিকে ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জ্জুন, গুরু দ্রোণাচার্য্য এঁরা সব আছেন, তাহার ভয় কি?

'আয় যমুনা!'—এক বুড়ী দড়ি হাতে করিয়া তাহার গরু খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। 'খাসা ছেলেটি ত! ওগো বাছা, তুমি কাদের ছেলে? একলাটি এত রাত্তিরবেলায় কোথায় যাচ্ছ?'

মণ্টু বলিল, 'সঙ্গে আমার পিতামহ, গুরুদেব এঁরা আছেন। তুমি একটা গাই খুঁজচ ত?—এই—এই পথ দিয়ে শীগগির যাও—এই একটু আগে তোমার গরু গেল এই পথে!'

মিথ্যা না বলিলে বুড়ীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। এখনই সে লোকজন জড় করিয়া একটা গোলযোগ বাধাইয়া তুলিবে।

বুড়ী চলিয়া গেলে মণ্টু ভাবিল, সে ঐ কাঁটালগাছটায় লুকাইয়া থাকিবে। তারপর বেশী রাত্রি হইলে যখন লোকচলাচল বন্ধ হইবে তখন সে ঐ বারোয়ারী ঘরে গিয়া শুইয়া থাকিবে।

মণ্টু কাঁটালগাছে উঠিয়া বলটাকে একটা ডালের ফাঁকে রাখিয়া দিল। ছোট-বড় কত এঁচোড় কাঁটাল ঝুলিতেছে। বসিয়া বসিয়া মণ্টু কত কি ভাবিতেছিল। এ সময়ে কাঁটাল না পাকিয়া ভালই হয়—যুত্ করিয়া আম খাওয়া চলে।

কিন্তু উহারা সব কাহারা, বারোয়ারী তলায় আসিয়া আড্ডা করিয়া বসিল? মাছুর বিছাইয়া তাসের আড্ডা! এরা কি তবে রাত্তিরে এখানেই থাকিবে নাকি?

একে একে আরও ছেলে আসিয়া জুটিল! তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি আর বাঁশী। এরা কি তবে স্কাউট নাকি? কিন্তু রাত্রিবেলা স্কাউটের দল এখানে কি করিবে?

মণ্টু বুঝিল, এটা 'ডিফেন্স পার্টি'—গ্রামের স্বদেশী চৌকিদার। রাত্রিতে তাহা হইলে ঘুম আর অদৃষ্টে নাই। মণ্টু কাঁটালগাছে বসিয়া ডিফেন্স পার্টির পাহারা দেখিতে লাগিল!

একদল তাস খেলিতেছে আর একদল পাহারা দিতেছে। আবার উহারা আসিয়া তাস খেলিতেছে এবং যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহারা পাহারা দিতে যাইতেছে। পাহারা ত ভারি! এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া গল্প করা আর আম কুড়ানো।

রাস্তার পাশেই একটা বড় আমগাছ। মণ্টু দেখিল, ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা বেশ এক ঝুড়ি আম কুড়াইয়াছে। মণ্টুর ইচ্ছা, উহাদের সহিত একটু রসিকতা করে। একা একা কাঁহাতক চুপ করিয়া গাছের ডালে বসিয়া থাকা যায়?

মণ্টু একটা ছোট কাঁটালের এঁচোড় ছিঁড়িয়া ঠন্ করিয়া টিনের উপর ফেলিয়া দিল।

ডিফেন্স পার্টির স্বদেশী চৌকিদারেরা অমনি পাকা আম পড়িয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় আম? তাহারা অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া কিছুই পাইল না।

মণ্টু গাছের উপর হইতে মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

কিছুক্ষণ গেল। মণ্টু আর একটা এঁচোড় ছিঁড়িয়া ঢুম্ করিয়া যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহাদের মাথার উপর টিনের চালে ফেলিয়া দিল। তাস ফেলিয়া অমনি সকলে আম কুড়াইতে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু আম পাইল না, পাইল একটি ছোট এঁচোড়।

কিছুক্ষণ পরেই দূর হইতে ডিফেন্স পার্টির কে একজন হুইস্‌ল্ দিল।

অমনি যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহারা উঠিয়া লাঠি আর আলো লইয়া পাহারা দিতে গেল—আর যাহারা পাহারা দিতেছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সটান মাদুরের উপর পড়িয়া গেল।

সব চুপচাপ।

নীচেয় উহারা বেশ আরামে ঘুমাইবে আর মণ্টু গাছের ডালে ঠায় বসিয়া বসিয়া কেবল মশার কামড় খাইবে, ইহা তাহার পছন্দ হইল না। মণ্টু আস্তে আস্তে আর একটি এঁচোড় ছিঁড়িয়া দুম্ করিয়া টিনের উপর ফেলিয়া দিল। এবারকার এঁচোড়টা একটু বড়। এঁচোড়টা গড়াইতে গড়াইতে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। যাহারা ঘুমাইতেছিল তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল। তাইত! সদ্য ছেঁড়া এঁচোড় এভাবে ছিঁড়ে ফেল্লে কে?

একটা তোৎলা ছেলে আর একটা ছেলেকে বলিল, 'পি—পি পিসীমার কাছে শুনেছি, ও—ও—ওই গাছে একটা আ-আ আছেন।'

ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহারা আবার শুইয়া পড়িল।

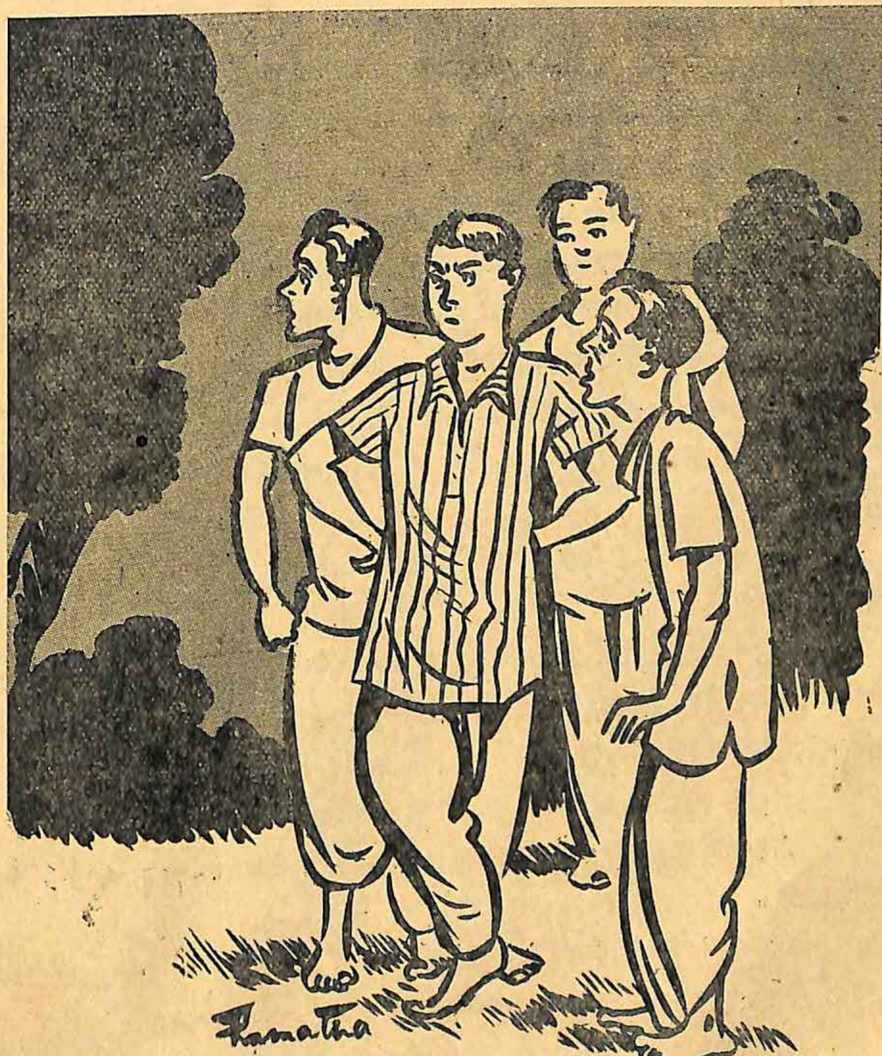
জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। রাত্রিও আর বেশী নাই। চারিদিকে নিঝুম—চুপচাপ! মণ্টুর মনের মধ্যে তখনও সেই তোৎলা ছেলেটির "একটা আছেন" কথাটি বার বার জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিল, সত্যিই এ গাছে ব্রহ্মদত্তি-টত্তি কিছু আছে নাকি?

থাক্ না থাক্, একা একা এভাবে অন্ধকার গাছের ডালে বসিয়া থাকা মুস্কিল।

ইস্কুলে মণ্টু স্কাউটদের পাণ্ডা ছিল। টাই বাঁধা, ওথ, হুইসেলে কখন কিভাবে সঙ্কেত করিতে হয় তাহা সে জানিত।

মণ্টু তার গলার হুইস্‌ল্ বাঁশীটা লইয়া বিপদসূচক একটা হুইস্‌ল্ বাজাইয়া দিল!

যাহারা পাহারা দিতেছিল তাহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, যাহারা ঘুমাইতেছিল তাহাদেরও কেহ কেহ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।



সকলেই অবাক্ !—হুইস্‌ল্ দিল কে ?

একটা লোক ছিল তাহার মধ্যে খুব চালাক। সে বলিল, "হুইস্‌ল্ যে দিয়েছে এঁচড় ছেঁড়াও তারই কাজ। সে চোর নিশ্চয়ই এই কাঁটালগাছে আছে।'

তোৎলা ছেলেটি ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে বলিল, 'পি—পি—পিসীমার কাছে শুনেছি, তানারা বাঁশী বাজিয়ে গানও করেন।'

আর একটা যোয়ান ছেলে তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিল, 'তুই বাপু বাড়ী গিয়ে তোর পিসীমার আঁচল ধ'রে ব'সে থাক গিয়ে।'

আর একজন মালকোচা বাঁধিয়া বলিল, 'কাঁটাল গাছেই উঠা যাক্।'

মণ্টু দেখিল, সর্ব্বনাশ! একে একে উহারা সকলেই গাছে উঠিয়াছে! মহা ফ্যাসাদ! ধরা পড়িলে রক্ষা নাই। মণ্টু বলটি তুলিয়া লইয়া টিনের উপর মারিল এক লাফ! সেখান হইতে আর এক লাফে একেবারে রাস্তায়।

'ধর ধর চোর!'—ডিফেন্স পার্টির লোক তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া পড়িল।

মণ্টু বুঝিল—এই বিদেশ বিভূঁই অচেনা জায়গায় উহাদের সহিত ছুটিয়া পারা যাইবে না।

সম্মুখে মাঠের মধ্যে একটা ইক্ষু ক্ষেত। মণ্টু ইক্ষু ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু ইক্ষু গাছের পাতাগুলির কি ধার! মণ্টু ভাবিল সে ওর ভিতর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচে।

এদিকে জোরেও চলা যায় না—শুকনো পাতাগুলিতে খচ-মচ শব্দ হয়।

গ্রাম-রক্ষীদের দল তখন বড় বড় লাঠি লইয়া ইক্ষু ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

মণ্টু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ক্ষেতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে দেখিল সম্মুখে একটি নদী। নদীটি খুব বড় এবং স্রোতও খুব।

কিন্তু আর অন্য উপায় নাই। উপরে থাকিলে মণ্টুর প্রাণ-সংশয় হইবে। মণ্টু বলটিকে বুকে লইয়া ঝুপ্ করিয়া নদীর মধ্যে নামিয়া পড়িল। শক্ত পাম্প-

করা পাঁচ নম্বর বলটি তাহার 'লাইফ বেল্ট'এর কাজ করিল। মণ্টুর একটুও সাঁতরাইতে হইল না—সে বলটির উপর ভর দিয়া রহিল, আর স্রোতে আপনিই তাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

অনেক দূর গেলে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

ডিফেন্স পার্টির দল তখনও তাহাকে ইক্ষু ক্ষেতের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে!

মণ্টু দেখিল, সম্মুখে নদীর পাড়ে একটি বড় বাজার, আর তারই পাশে রেলওয়ে ইষ্টিশান। মণ্টু বাজারের ঘাটে গিয়া উঠিল। কোথাও লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই। মণ্টু তাড়াতাড়ি হাফ-প্যাণ্টটা নিংড়াইয়া লইয়া রুমাল দিয়া মাথা মুছিয়া লইল। তারপর এক দোকানের সম্মুখে মাচানের উপর বলটি কোলের মধ্যে লইয়া সে শুইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার ঘুম পাইতেছিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে মণ্টু দেখিল একটু একটু রোদ উঠিয়াছে। বাতাসে তাহার হাফ-প্যাণ্ট ও রুমাল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে।

একটা বিয়ের বরযাত্রীর দল সেখানে জটলা করিতেছিল। তাহারা ভোর পাঁচটার গাড়ী ধরিতে পারে নাই। আর একটা গাড়ী আছে সেই সাড়ে বারটায়।

কিন্তু এতক্ষণ তাহাদের কাটে কিসে?

মণ্টুর কাছে বল দেখিয়া তাহাদের বড় ইচ্ছা হইল—ফাঁকা মাঠে একবার নামিয়া যায়। মণ্টুরও তাহাতে আপত্তি ছিল না।

খেলা আরম্ভ হইল। ভিজা বল খেলিয়া আরাম নাই; কিন্তু মনের উৎসাহ যেখানে বেশী, বলের অসুবিধা সেখানে কিছুই করিতে পারে না।

মণ্টুর খেলা দেখিয়া বরযাত্রীর দল অবাক্ হইয়া গেল!—এতটুকু ছেলে কিন্তু শট্এর কী জোর!—বল লইয়া চলিয়া যায় যেন, কলিকাতার মাঠে ঠিক সেই চীনেম্যানদের মত!

খেলিবার পর মণ্টু সেই বরযাত্রীদের সঙ্গে বেশ একচোট ফলার মারিল। তাহাদের সহিত মণ্টুর ভাবও হইয়া গেল খুব।

মণ্টু কিন্তু তাহার আসল পরিচয় দিল না; বলিল, সেও গাড়ী ফেল করিয়াছে, সাড়ে বারটার গাড়ীতে যাইবে।

বরযাত্রীর দল রাণাঘাট পর্য্যন্ত যাইবে। সেখান হইতে মুর্শিদাবাদ লাইনে কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপ।

মণ্টু বরযাত্রীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। তারপর তাহাদের অনুরোধে পড়িয়া রাণাঘাট হইতে একেবারে নবদ্বীপ। ফুটবল প্লেয়ার মনে করিয়াই হউক অথবা বরযাত্রীদের একজন মনে করিয়াই হউক মণ্টুর নিকট কেহ টিকিট চাহিল না।

বিবাহ শেষ হইল। বরযাত্রীর দল বাড়ী ফিরিল, কিন্তু মণ্টু সেখান হইতে নড়িবার নামও করিল না।

মেয়ের পিতা পূর্ণবাবুর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার স্ত্রী এই কুড়াইয়া পাওয়া ছেলেটিকে পাইয়া পুত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছু-দিনের মধ্যেই মণ্টু সে-বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িল। পূর্ণবাবু পুলিশের চাকুরী করিতেন। এখন পেনসন লইয়া বাড়ীতেই আছেন। ঘোড়ায় চড়া পূর্ণবাবুর চিরকালের অভ্যাস। ইহাতে তাঁহার সখও ছিল যথেষ্ট। ভাল ঘোড়া পাইলেই তিনি কিনিতেন। পেনসন লওয়ার পরও তাঁহার বাড়ীতে দুই-তিনটি ঘোড়া ছিল। কিন্তু বয়স বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাবুর ঘোড়ায় চড়িবার সখও কমিয়া যাওয়ায় ঘোড়াগুলি কেবল বসিয়া বসিয়া দানা খাইতে-ছিল। মণ্টু প্রথম দিনই সব চাইতে বড় ঘোড়াটি লইয়া খুব খানিক ছুটিয়া আসিল। পূর্ণবাবু ভাবিলেন, 'যাক্ এতদিনে ঘোড়াগুলোর একটা উপায় হ'ল। বাত রোগে ভুগে ওরা আর পঙ্গু হ'য়ে প'ড়ে থাকবে না।'

মণ্টু সারাদিন টো টো করিয়া নবদ্বীপ সহর ঘুরিয়া বেড়ায়। রাধে-শ্যামের বাড়ী, সমাজ বাড়ী, মহাপ্রভুর মন্দির, পাতাল-পুরী, সাধু এই সব কত কি সে দেখে। এক সাধু—'মৌণীবাবা' তাঁহার নাম, দরজায় সাইনবোর্ড টানাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার আসনের নীচে কতকগুলি মানুষের মাথা। সম্মুখে থালায় টাকা, আধুলি, সিকি এই সব ছড়ান। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "এই সাধু একশো উনিশটি মানুষের মাথার উপর বসিয়া দিবারাত্র ধ্যান করেন এবং ইনি কাহারও সহিত কথা বলেন না।"

সাধুকে দেখিয়া মণ্টুর কৌতূহল হইল। সে গুণিয়া দেখিল মাত্র তেরটি মানুষের মাথার উপর সাধু বসিয়া আছেন; 'একশো উনিশটি' মিথ্যা কথা। মরা মানুষের উপর মণ্টুর চিরদিন খুব শ্রদ্ধা। যাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শবদেহকে বা দেহের কোনও অংশকে লইয়া উপহাস বা ছেলে-খেলা করা সে খুব হীন কাজ বলিয়া মনে করিত। মণ্টু বুঝিল, সাধুর কেবল পয়সা লইবার মতলব। কিন্তু এই হীন প্রলোভন দিয়া মানুষের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিবার ফন্দিতে, মরা মানুষের মাথার উপর বসিয়া সাধু আরও হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। মণ্টুর মনে হইল ঐ তেরটি কুড়াইয়া পাওয়া নরমুণ্ডের মধ্যে হয়ত এমন কাহারও মাথা আছে, যিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত অথবা পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ।

সাধুর ঘরের পিছনে এক ফালি জমি। সেখানে কলমের আমগাছ লাগান হইয়াছে। একটা গাছে বড় বড় দুই-তিনটি আম পাকিয়া আছে। গাছটি জাল দিয়া ঢাকা। মণ্টু আস্তে আস্তে সাধুর নিকট গিয়া বলিল, 'সাধু বাবা, আপনি ত' ধ্যানমগ্ন আছেন এবং কথাও বলবেন না জানি। তবু পাছে চুরি করা হয় এই ভয়ে আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, আপনার ঐ কলমের গাছের তিনটে পাকা আম আমি খেয়ে গেলাম। আপনি ত নির্লোভ সাধু লোক, ক্ষুধার্ত্তকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য দানে নিশ্চয় আপনার আপত্তি হবে না।'

শুনিয়া সাধু উস্‌-খুস্‌ করিতে লাগিলেন, এই বকাটে ছোঁড়া আবার বলে কি! সত্যিই ও কলমের গাছের আম খাবে নাকি?

মণ্টু বাগানের দিকে চলিল।

খুক্ খুক্ খুক্—সাধু তিনবার কাসিলেন। দরজার আড়াল হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কে বলিল, 'কি বলছ?'

'একটা বকাটে ছোঁড়া কলমের গাছের আম ছিঁড়তে গেছে—শীগ্‌গির থামাও।'

বাড়ীর ভিতর হইতে তখনই ঝাঁঝা গলার চীৎকার উঠিল, 'ক্যাঁ-রে?'

মণ্টু বলিল, 'আমার নাম সাধুচরণ। সাধুদের চরণ সেবা ক'রেই আমি দিন কাটাই।'

'তা সাধুর কাছে যা না—বাগানের মধ্যে কি?'

'সেই কথাই ত সাধুকে ব'লে এলাম। সাধু ত আর কথা বললেন না। তাই মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ মনে ক'রে আমি আম নিতে যাচ্ছি।'

তারপর সাধু-গিন্নীর সহিত মণ্টুর প্রবল কলহ। সাধু গতিক খারাপ দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। রফা হইল। একটি আম লইয়া মণ্টু বাসায় ফিরিল।

সাধু বুঝিলেন, এইরূপ দুই-একটি ছেলের পাল্লায় পড়িলেই তাঁহার আসন-টাসন গুটাইতে হইবে আর কি!

'পোড়া-মা তলার' নাম শুনিয়া মণ্টু তাহা দেখিতে গেল। দেখিল, একটা অশ্বত্থগাছের তিনদিকে পাথর দিয়া বাঁধান। উপরে টিনের শেড্। কত পণ্ডিত এখানে বসিয়া গীতা, ভাগবত ও পুরাণ পাঠ করিতেছেন। মণ্টু উঁকি মারিয়া অতিকষ্টে সেই অশ্বত্থগাছের নীচে ফোকরের মধ্যে একটা সিন্দুর-মাখা ঘট ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

ডানদিকে একটি সুন্দর শিব-মন্দির। সেখানে প্রকাণ্ড এক পাথরের শিব আছেন। বাঁদিকে শবাসনা কালী। কিন্তু 'পোড়া-মা তলার' মা কোথায়?

মণ্টুর কেমন খট্‌কা লাগিল। আস্তে আস্তে সে এক পণ্ডিতের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর মশায়, পোড়া-মাকে ত দেখতে পাচ্ছি না! মা কি তবে একেবারেই পুড়ে গেছেন?'

পণ্ডিত মহাশয় এই বালকের কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, 'এর নাম ঠিক পোড়া-মা নয়, অথচ লোকে বহুদিন থেকে একে পোড়া-মা তলাই বলে আসচে।' পণ্ডিত মহাশয় মণ্টুকে বুঝাইয়া দিলেন, 'নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতেরা সব এইখানেই গাছতলায় ব'সে লেখাপড়া করতেন। এখানে তাঁরা একটি বিদ্যামূর্ত্তি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর নাম 'বিদগ্ধ জননী'। এটা পণ্ডিতদের একটা সভা—যেমন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়—একটা শিক্ষা-বিস্তারের সংগঠিত স্থান। বিদগ্ধ কথাটির অর্থ—যাঁর অজ্ঞতা পুড়ে গিয়েছে অর্থাৎ যিনি পণ্ডিত। সেই পণ্ডিতদের জননী অর্থাৎ যে স্থান বা সভায় তাঁহারা জ্ঞানলাভ করছেন।'

কিন্তু সাধারণ মানুষ এই 'বিদগ্ধ' কথাটি উচ্চারণ করতে পারে না, তার মানেও বোঝে না। এইজন্য লোকে 'বিদগ্ধ জননীর' বদলে 'পোড়া-মা' ব'লেই এই স্থানের পরিচয় দেয়।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া মণ্টু নিজের অজ্ঞতার জন্য একটু লজ্জা বোধ করিল। তাহার সারদা পণ্ডিতের কথা মনে পড়িল,—'বল্কল' মানে গাছের ছাল, কিন্তু কোন্ গাছের ছাল, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে সারদা পণ্ডিতের কাছে মার খাইয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া মণ্টু বাসায় ফিরিল।

এদিকে মেয়ের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া যাওয়ায় পূর্ণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী একটা গুরুতর কর্ত্তব্যভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পূর্ণবাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা, এই সময়ে তিনি একবার ৺পুরীধামে বেড়াইতে যান।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী পুরী যাইবেন শুনিয়া ঘনবর উড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

তাহার প্রার্থনা, 'মা ঠাকুরাণীর সঙ্গে চাকর ত লাগিবে? ত মুই যাইবো। মুই কাপড় কচিব, প্রভু জগড়নাথ দরশন করইব।'

কিন্তু কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা মণ্টুও তাঁহার সঙ্গে যায়। বড় চালাক ছেলে মণ্টু। সে সঙ্গে থাকিলে তাঁহার কোনও অসুবিধা হইবে না। পুরী যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হইল।

ঘনবর ঘন ঘন আনাগোনা করিতে লাগিল। সে স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সার্টিফিকেট যোগাড় করিয়াছে। বালেশ্বর জেলার ওদিকে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ভায়ের জমিদারী আছে। ঘনবর বলে, সে তাঁহাদের প্রজা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীও ভাবলেন, বালেশ্বর জেলায় যখন ওর বাড়ী তখন ঘনবর তাঁহার ভায়ের প্রজা না হইয়া যায় না; সুতরাং ঘনবরকে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল। তাহার মাহিনা কর্ত্রী ঠাকুরাণীই মাসে দশটাকা হিসাবে ঠিক করিয়া দিলেন। অন্যলোক পাঁচ টাকাতেও পাওয়া যাইত।

কিন্তু ঘনবরের যাওয়ায় একটু ব্যাঘাত হইয়াছিল। যে বাড়ীতে সে কাজ করে, তাহারা নাকি তাহাকে ছাড়িতে চায় না। সেবার বালেশ্বর জেলায় বন্যা হওয়ায় সে ঐ বাড়ীর কর্ত্তার নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইয়াছিল। তাহা শোধ করিয়া না দিলে তাহারাই বা ছাড়িবে কেন?

অগত্যা ঘনবরকে একমাসের মাহিনা দশটাকা আগাম দেওয়া হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘনবর আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার আড্ডার দিকে গেল। বলিয়া গেল, সে সেখান হইতে তার কাপড়-চোপড় এবং বটুয়ার থলে লইয়া যথাসময়ে আসিবে।

পাঁচটার সময় গাড়ী। সাড়ে তিনটার মধ্যে যখন ঘনবর ঠাকুরের টিকিও দেখা গেল না, তখন মণ্টু তাহার সন্ধানে বাহির হইল। নদীর ধারে কলা বাগানটার পাশে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে উড়ে ঠাকুরদের যে আড্ডা ছিল মণ্টু তাহা জানিত। কিন্তু সেখানে দেখে, আড্ডার চারিদিকে এমন করিয়া বেড়া দেওয়া যে, সদর দরজা পাওয়াই মুস্কিল। অনেক ডাকাডাকির

পর কে একজন উত্তর দিল বটে কিন্তু দেখা দিল না। এদিকে মণ্টু গাড়ীর সময় চলিয়া যায় দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তখন সে বেড়া টপকাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া দেখে, বাড়ীর ভাঙ্গা পাঁচিলটা ছাড়িয়াই ডানদিকে একটা তুলসীমঞ্চ, তার পাশে উঁচু রোয়াক, উপরে খড়ের চাল। সেখানে চৌকি পাতিয়া বসিয়া খুব পালোয়ন গোছের মাথা-মুড়া গেরুয়া-পরা একটি লোক। লোকটির কপালে ও হাতে খুব বড় বড় তিলক কাটা, গলায় তুলসীর মোটা মালা। সে 'চৈতন্য চরিতামৃত' সুর করিয়া পাঠ করিতেছে। আশে-পাশে দুই-একটি ভক্তলোক বসিয়া তাহা শুনিতেছে।

এতগুলি লোক নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া আছে, অথচ সে ডাকিয়া কাহারও দেখা পায় নাই মনে করিয়া মণ্টুর মেজাজটা কেমন রুক্ষ হইয়া উঠিল!

'ঘনবর কোথায় ?'

কাহারও কোন উত্তর নাই!

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘনবর ঠাকুর আছে এখানে ?'

'আছে।'

'কোথায় ?'

কোন উত্তর নাই! ডাকিয়া দিবারও কাহারও কিছু গরজ দেখা গেল না। মণ্টু উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কি কানে কম শোন, না কোন নেশা করেছ ?'

এবার কৌপীন-পরা সেই গোঁসাইটি হেড়ে গলায় উত্তর করিল, 'ঘনবরকে তোমার কি দরকার ?'

'সে আমার সঙ্গে পুরী যাবে!'

'না, সে যেতে পারবে না।'

'পারবে না মানে ? পারবে না ত টাকা আনলে কেন ?'

গোঁসাই চরিতামৃত বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'আরে, এ ছোকরার ত বড় লম্বা লম্বা কথা।' মণ্টু ঘনবরকে চোখে আঙ্গুল দিয়া সময়টা দেখাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে

হাত-ঘড়িটা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোঁসাই ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওটা কি ঘড়ি? ক'টা বাজে তোমার ঘড়িতে?'

'আগে ঘনবরকে টাকা ফেল্‌তে বল।'

'যদি সে টাকা না দেয়?'

'না দেয় মানে? জুতিয়ে টাকা আদায় করব।'

গোঁসাই মুখ বিকৃত করিয়া কেমন একটা শব্দ করিলেন, অমনি পাঁচ-ছয়জন ষণ্ডা গোছের লোক বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মণ্টুকে ঘিরিয়া ফেলিল। গোঁসাই বলিলেন,—'ঘড়ি আর হাতের আংটিটি খোল দেখি খোকা।'

মণ্টুর বুকের মধ্যে তখন দুরু দুরু করিয়া উঠিলেও সে ঘাবড়াইবার ছেলে নয়! সে একগাল হাসিয়া বলিল, 'ওসব ভয় দেখাচ্ছ কাকে? তোমার মত অনেক গোঁসাই আমি দেখেছি।'

মুখে এইসব বোল-চাল দিলেও সেই ডাকাতের হাতে পড়িয়া একা মণ্টু কি করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। সে কেমন অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে হাত দিয়া হুইস্‌ল্‌ বাঁশীটি লইয়া অভ্যাসবশতঃ তাহাতে খুব জোরে একটি ফুঁ দিয়া ফেলিল!

ভক্তবৃন্দ হুইস্‌ল্‌ দেওয়ার অর্থ হয় ত বুঝিত। বাঁশীতে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল,—সে গোঁসাইও নাই, সে ডাকাতের দলও নাই! কোথায় তাহারা উধাও হইয়া গিয়াছে।

মণ্টু এই অবসরে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পড়িল এবং একদৌড়ে বাসায় আসিয়া পূর্ণবাবুকে সব কথা বলিল। পূর্ণবাবু পুলিশে চাকরী করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। তাঁহাকে পুলিশের অনেকেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় এই সংবাদ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সাহেবের নিকট খবর পাঠাইলেন। তারপর নিজেই কতকগুলি পুলিশ লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। ডাকাতের দলে কয়েক জন পলাইয়া গিয়াছিল। যাহারা পলাইতে পারে নাই, তাহাদের সকলেই ধরা পড়িল। গোঁসাই বাবাজীকে পূর্ণবাবু

চিনিতে পারিলেন। সে একজন নামজাদা ডাকাতের সর্দ্দার, এগারবার জেল খাটিয়াছে!

'আরে, এযে আমাদের এক্রাম মিয়া! এই সাত বচ্ছর তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ঘুরছে! আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে শেষে পেনশান নিয়ে নবদ্বীপে এসে বসলাম, আর তুমি কিনা আমারই বাড়ীর কাছে বসে চৈতন্য চরিতামৃত পড়ছ!'

এক্রাম মিয়া গম্ভীর গলায় উত্তর করিল, 'এক্রাম সর্দ্দারের মাথা ছিল বাবুজী। সব দিকই বেশ আঁট-ঘাট বেঁধে নিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গেও অল্পদিনের মধ্যেই আমার মোলাকাত হ'ত। এতদিন ধ'রে সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে আমায় খুঁজছিলেন, একবার দেখা না ক'রে পারা যায়! এতবড় মেহানতের চাকরী থেকে বিদায় নিলেন, তার একটা অভিনন্দনও ত আমাদের জানান উচিত! শীগ্‌গিরই আপনাদের একে একে নিমন্ত্রণ করতাম; কিন্তু উড়ে গিয়ে কি কোনও কাজ হয়? আপনাদের সঙ্গে ও কি জোচ্চুরি মতলব ক'রেছিল কিছুই আমাকে জানায়নি। সামান্য পাঁচ-সাত টাকার লোভে ও ব্যাটা আমার সব প্ল্যান নষ্ট ক'রে দিল!'

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর তাহার হাতে শক্ত লোহার কড়া পরাইয়া চালান দিলেন। আখড়ার তুলসী মঞ্চটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক চুরি-ডাকাতি-করা গহনা-পত্রও বাহির হইয়া পড়িল!

বিলের ধারে কত সব ছোট বাবলাগাছের চারা। বর্ষার প্লাবনে এই সব গাছের উপর দিয়া জল চলিয়া গিয়াছে,—তাহাদের ডালে বসিয়া আছে কত সব খড়কুটো, শুকনো কচুরী-পানার গাছ! স্থানটি বেশ নির্জ্জন—এখানে আসিলে মণ্টুর মনটা কেমন হইয়া গেলেও রোজই তাহার এখানে আস চাই-ই। এখানে সহরের কোলাহল নাই, নিজেকে নিজের মধ্যে একান্তভাবে যেন এখানে আসিলেই পাওয়া যায়! বাড়ীর সকলের কথা এখানে আসিয়া ভাবিলেও যেন তার কত সুখ—পূণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপের মন্দির, অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তন, সহরের জাঁকজমক কিছুই

যেন তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না। মণ্টুর ভাল লাগে নবদ্বীপের পুরাতন ইতিহাস, পণ্ডিতদের টোল, বকুলতলা ইস্কুলের জিমনাষ্টিক আর গঙ্গার ধূ ধূ ফাঁকা চড়া। ললিতা সখী বিদ্বান ও এতবড় শক্তিমান পুরুষ হইয়াও কি করিয়া দিনরাত অবগুণ্ঠিতা সাজিয়া থাকেন আর মিহিসুরে মেয়েলী ঢং-এ কথা বলেন মণ্টু তাহা ভাবিয়া পায় না!

বৈষ্ণব শাস্ত্রের 'গোপীভাব' 'সখীভাব' ওসব মণ্টু বুঝিতে পারে না। কোন্ একটা ইংরিজি বইতে সে পড়িয়াছিল, 'Man for the field and woman for the hearth' কথাটি মণ্টুর বেশ লাগে। পুরুষ হইবে শক্তিমান, ফুটবলে কিক করিয়া বলটাকে সে দিবে আকাশে উড়াইয়া, সে করিবে যুদ্ধ ; ঘোড়া ছুটাইয়া সে আকাশ আর পৃথিবী ধূলায় এক করিয়া দিবে।

লাগামটায় একটা জোর টান দিয়া মণ্টু কিছুদূর ঘোড়া ছুটাইয়া যায়। আবার তাহার মাথায় কত সব চিন্তা, কত কথা, কত কল্পনা আসিয়া ভিড় করে।

পাতালপুরী—সাধুর পুরীটাকে ঠিক পাতাল কি করিয়া বলা চলে মণ্টু তাহা বুঝিতে পারে না।······আচ্ছা, দেবতা যদি সকলের, তবে 'ভেট' না দিলে দেব-দর্শন করিতে দেয় না কেন? শ্রীচৈতন্য কি ঠিক এই নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তবে ওপার 'মায়াপুরে' ওটা কি? এরা বলেন, ওটা মিয়াপুর—মুসলমানের জায়গা, ওরা বলেন, এই ত মায়াপুর শ্রীচৈতন্য যেখানে জন্মগ্রহণ করেন—গঙ্গার পূর্ব্বকূলে এইখানেই ত 'খোলভাদার মাঠ'—এইখানেই ত বল্লাল সেনের ঢিবি!······হঠাৎ একদিন শ্রীচৈতন্য আসিয়া বলিয়া গেলে পারিতেন যে, বাপু, আমি এপারেও আছি ওপারেও আছি!

প্রায় একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ঘনবরের কোনও সন্ধান নাই। পূর্ণবাবু ঠাট্টা করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার ভাইকে একখানা চিঠি লিখে দাও—তার প্রজাকে একবার এদিকে পাঠিয়ে দিক্—আমি তার প্রজার জন্যে একটা শ্বশুরবাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছি যে!'

মণ্টু রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। নবদ্বীপের পশ্চিমে

বিলের ধারে তাহার বেড়াইতে বড় ভাল লাগে—বিলের কালো জলের মধ্যে 'পাট' পাতিয়া ধোপারা সব হুস্-হুস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছে, ঘোড়ার সহিসরা দল বাঁধিয়া লম্বা ঘাস টানিয়া টানিয়া এক জায়গায় জমা করিতেছে। বিলের মধ্যে কত পদ্মফুল ফুটিয়া আছে। কালো কালো ডাহুকগুলি কলমীফুলের বনে কেমন খেলা করিতেছে। এই নির্জ্জন জায়গায় আসিলে তাহার মনটা কেমন উদাস হইয়া যায় ;—মা, পিসীমা, বৌদি, বাবা এদের সকলের কথা তাহার মনে পড়ে। মণ্টুর ইচ্ছা হয় আবার সে বাড়ী ফিরিয়া যায় !

মণ্টুর বেড়াইবার পথে এক সাধু এতদিন একখানা পাথরে তেল-সিঁদুর মাখিয়া গাছতলায় বসিয়া থাকিত। 'যোগের' সময় যাত্রীর ভিড় হইত সেখানে। দুই-একটি শিষ্যও মধ্যে মধ্যে জুটিত। আজ হঠাৎ মণ্টুর নজরে পড়িল, সেখানে ঘর উঠিতেছে। মণ্টুর হাসি পাইল। দু'দিন পরে হয়ত সেখানে মন্দিরও উঠিবে, তারপর একটা বড় বাড়ী এবং তার পরই 'ভেট' না দিলে সেখানে ঠাকুর-দর্শন মিলিবে না !

মণ্টুর মনে প্রশ্ন ওঠে, 'ধর্ম্ম' জিনিষটা কি সত্যিই গোজামিল ?—সারদা মাষ্টারের টাক ঢাকিয়া রাখিবার ফন্দী—আর তাহা নিয়া পাঁচজনের সঙ্গে কলহ ? মণ্টুর মন বলে তা বোধ হয় নয়। মিথ্যা ভড়ং বা বাহিরের জাঁকজমকে পল্লীগ্রামের নিরীহ, ধর্ম্মভীরু যাত্রীদের ভুলান যায়, কিন্তু শিক্ষিতের মন সে আড়ম্বরে ভুলিবে কেন ? অনেক শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিও ত এখানে পেনশান লইয়া বাস করেন,—পূর্ণবাবুও ত করিতেছেন, কিন্তু সেটা কি বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা ? দুর্ব্বল হইলেই মানুষ ভগবানকে ডাকে ? তবে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিলেন কেন ? মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ ত মূর্খও ছিলেন না, বৃদ্ধও হন নি ! তবে ?—

মণ্টু ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল ! তাহার আর ভাল লাগিতেছে না। একটা ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধু সাজিয়া বসিলে মন্দ হয় না—দশ বৎসর পরে একেবারে লাল !—ঠাকুর, চাকর, ভক্ত, শিষ্য তখন দিন-রাত গিস্-গিস্ করিবে।

এমন সময় হয়ত একদিন পিসীমা আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে হয়ত মা, বৌদিও। তাঁহারা তখনও জানেন না, এতবড় সাধুটি আর কেউ নয়,—তাঁদের মণ্টু। সে কি মজা!

বৌদি হয়ত ধা করিয়া চিনিয়া ফেলিবেন। তখন বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া কান ধরিয়া বলিবেন, 'বেশ ক'রে সাবান দিয়ে গায়ের ছাইগুলো ধুয়ে ফেল দেখি সাধু!'

'বাবু!'

মণ্টু তখন বিলের ধারে একটা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পিছন হইতে কে ডাকিল, 'বাবু, এ বাবু!'

মণ্টু ঘোড়া থামাইল।

একজন ধোপা, তাহার পিঠে কতকগুলি কাপড়-চোপড়। সে বলিল, 'বাবু, এই বিলের মধ্যে একটা পাথরের সুন্দর ঠাকুর পাওয়া গেছে—দেখবে?'

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মণ্টু সেই কথাই ভাবিতেছিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে মণ্টু বলিল, 'চল দেখি কোথায়।'

'কাল সেটাকে আমরা ওই জঙ্গলের ধারের ভাঙ্গা বাড়ীটার মধ্যে রেখে দিয়েছি।'

মণ্টু তাহার সহিত সেই দিকে চলিল।

ভাঙ্গা দরজায় একটা শুকনো গাছের ডালে ঘোড়াটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া একা সেই অন্ধকার বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে মণ্টুর কেমন গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। কিন্তু এখানে আর কে তাহার কি করিবে! হাতে ঘড়ি বা আংটি-পরা এক্রাম মিয়ার ঘটনা হইতেই মণ্টু ছাড়িয়া দিয়াছে।

সুন্দর ত নয়ই—এমন কি ঠাকুরই নয়! একটা পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গা-টাঙ্গা হবে। তেল-সিঁদুর মাখানো।

'ঐ পাথরখানাকে অমন ধারা তেল-সিঁদুর মাখিয়েছ কেন তোমরা?'

'তোমাকে ঐখানে বলি দেব ব'লে।'

মণ্টু পিছনে চাহিয়া দেখে 'চরিতামৃতের' সেই সব শ্রোতা। সঙ্গে ঘনবর। মাথা মুড়িয়া সে ঢং একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে।



'আমাকে বলি দিয়ে তোমাদের লাভ ?

'লাভ ? গোয়েন্দাগিরি কর—লাভটা কি বুঝতে পারছ না! একটুখানি ছেলে, মুখ টিপলে এখনও ছুধ বেরোয়—যাও ডাকাতের দল ধরতে ?'

মণ্টু বুঝিল, ইহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা নিষ্ফল। বাঙ্গালী, উড়িয়া এবং পশ্চিমা মুসলমান এই তিন রকম লোকই এদের দলে রহিয়াছে। এক্রাম মিয়া ধরা পড়িবার পর ইহারা ঘোড়ার সহিস, ধোপা এবং সাধু সাজিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতেছে। মণ্টুর সহিত ইহাদের জাতক্রোধ। ইহাদের ধারণা, পূর্ণবাবু বিদেশ হইতে এই ক্ষুদে টিকটিকিটি আমদানী করিয়াছেন।

কাপড় কাচিবার ও ঘাস তুলিবার ভাণ করিয়া ইহারা সমস্ত দিন এবং কেহ কেহ রাত্রিতেও এই বিলের ধারে পড়িয়া থাকে।

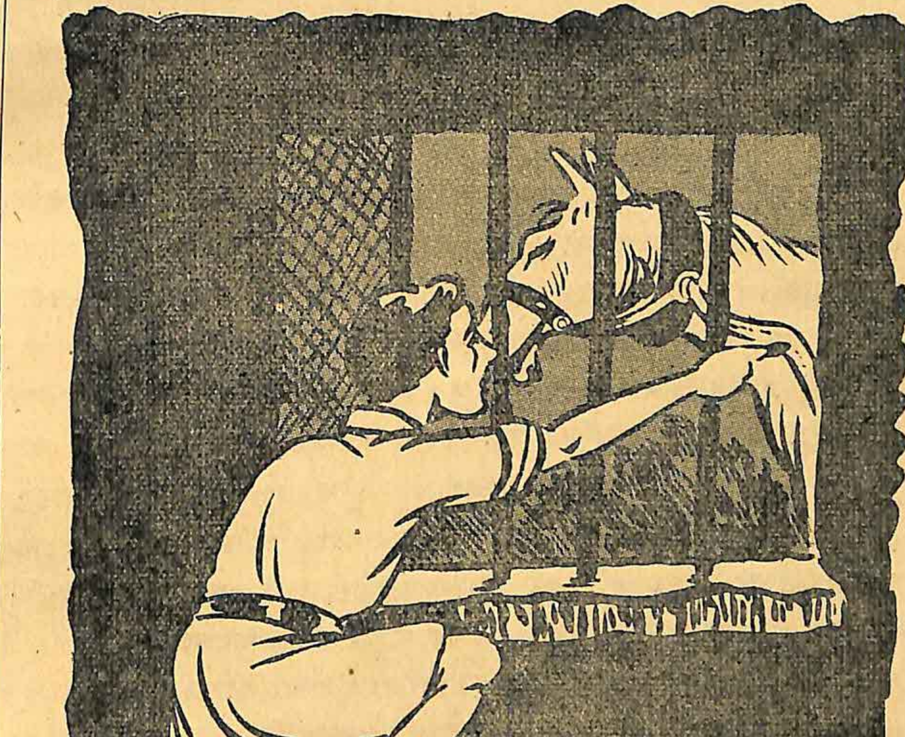
সমস্ত দিন মণ্টু সেই ছাদ-ভাঙ্গা স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া রহিল। ঘরের দরজা বাহির হইতে শক্ত করিয়া বন্ধ, জানালায় মোটা লোহার গরাদ। মণ্টুর পলায়ন-পথ অবরুদ্ধ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাশের ঘরে বসিয়া দস্যুদল পরামর্শ করিল,—গভীর রাত্রে মণ্টুকে হত্যা করিয়া তাহারা বিলের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়া দিবে! 'লাস' যাহাতে ভাসিয়া না ওঠে এইজন্য কতকগুলি ইটও কাপড়ে করিয়া ঐসঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইল।

মণ্টু সমস্ত শুনিল। সে ভাবিল, কোন রকমে বাহির হইয়া ঘোড়াটিকে পাইলে সে ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিত,—কিন্তু ঘোড়া কোথায়? মণ্টু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ঘোড়াটিকে কোনও দিকে তাড়াইয়া দিয়াছে হয়ত।

মণ্টুর শরীর অবসন্ন, মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করিতেছে। সে যেন আর ভাবিতেও পারিতেছে না।

ঘরের পিছন দিকে পুরাতন ঘর-ভাঙ্গা ইট-সুরকির ঢিবি। তাহার উপর কত সব লতান গাছ আর ঝোপ-জঙ্গল। অন্ধকার সেদিকে নামিয়া আসিতেছে। জানালা-পথ দিয়া মণ্টু চাহিয়া আছে। একটু পরেই সন্ধ্যা আসিয়া সমস্ত গাছপালা, অরণ্যের ছবি মুছিয়া যাইবে চিরদিনের জন্য তাহার চোখের সম্মুখ হতে—আর সে আকাশ, লতা, ফুল—বাবলাগাছের অমন চিকণ চিকণ পাতা, কিছুই আর



লাগামের সাদা পিঠে……কি সব লিখিয়া ফেলিল

দেখিতে পাইবে না। মৃত্যু তাহাকে কোন অজানা অন্ধকারে লইয়া যাইবে কে জানে?

ফ্রস্।

ঘোড়ার ঘাস খাইবার সময়কার নাসিকা-শব্দ। মণ্টু সচকিত হইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল, তাহারই সেই ঘোড়া। শুক্নো গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া হয়ত ঘাস খাইতে খাইতে এদিকে আসিয়াছে অথবা ডাকাতেরাই তাহাকে জঙ্গলের দিকে তাড়াইয়া দিয়াছে। মণ্টু ঘোড়ার দিকে হাত বাড়াইল। পুলিশ কর্ম্মচারীর শিক্ষিত মূল্যবান ঘোড়া। ঘোড়াটি সম্মুখের দুই পা তুলিয়া মণ্টুর হাতের কাছে মুখ আনিয়া দাঁড়াইল। মণ্টু সস্নেহে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। শেষ স্নেহ-স্পর্শ! মণ্টু মনে মনে বলিল, বন্ধু, বিদায়!

ঘোড়াটি এদিকে দাঁত দিয়া জানালার গরাদে ভাঙ্গিতে চায়, অর্থাৎ মৌন ভাষায় ঘোড়ার ইঙ্গিত এই—বন্ধু, জানালা ভাঙ্গিয়া বাহির হও, এই আমি পিঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছি। কিন্তু লোহার গরাদে ভাঙ্গা অসম্ভব।

আনকোরা নতুন লাগাম জোড়া ঘোড়ার গলায় দুলিতেছে। হঠাৎ মণ্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। ঘরের এককোণে কতকগুলি কাঠের কয়লা পড়িয়াছিল, মণ্টু একখানা কয়লা আনিয়া সেই নতুন লাগামের সাদা পিঠে তাড়াতাড়ি কি সব লিখিয়া ফেলিল।

লেখা শেষ হইলে মণ্টু ঘোড়াটিকে বাড়ী ফিরিবার জন্য সঙ্কেত করিল। ঘোড়াটি যেন তাহা বুঝিল। আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল;—মণ্টু দেখিল পূর্ব্বগগনে ধূলি উড়াইয়া ঘোড়াটি ছুটিতেছে। নির্ণিমেষ নয়নে মণ্টু সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সমস্ত দিনের মধ্যেও মণ্টুকে ফিরিতে না দেখিয়া বাড়ীর লোক এবং পাড়ার লোক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পূর্ণবাবু অনুমান করিলেন, নিশ্চয়ই সে ডাকাতের

হাতে পড়িয়াছে। তিনি তখনই চারিদিকে লোক পাঠাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায়ও সংবাদ দিলেন।

ঘাটে, পথে, বাজারে—লোকের মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, মণ্টু নামে ছেলেটিকে ডাকাতের দল কোথায় সরাইয়া ফেলিয়াছে।

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর পূর্ণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছেন, কনেষ্টবলেরা পোষাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চৌকিদারেরাও একসঙ্গে জড় হইয়াছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রী সমস্ত দিন অনাহারে আছেন। পরের ছেলে কেনই বা তিনি স্থান দিয়েছিলেন!—এই তাঁহার দুঃখ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে হ্রেষারব করিতে করিতে পূর্ণবাবুর ঘোড়া সওয়ার-হীন খালি জিন লইয়া বাড়ী পৌঁছিল। মণ্টু নাই।

সকলে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। পূর্ণবাবু আলো আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঘোড়ার গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে কিনা।

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর লাগামটি ধরিয়াছিলেন—'দেখি, দেখি! লাগামের গায়ে যেন কি সব লেখা রয়েছে।' তাড়াতাড়ি চসমা জোড়া চোখে ল্যগাইয়া তিনি পড়িলেন, 'বিলের ধারে ভাঙ্গা বাড়ীতে ডাকাতের হাতে বন্দী। আজ রাত্রে খুন ক'রে বিলের মধ্যে পুতে রাখবে। ধোপা ও ঘোড়ার সহিস সেজে যারা এখানে থাকে তারাই ডাকাত—মণ্টু।'

বিলের ধারের ভাঙ্গা বাড়ীতে চারিদিকের অন্ধকার জমাট হইয়া আসিতেছে। মণ্টুর মনের অন্ধকার আরও বেশী। সে কান পাতিয়া আছে, এই বুঝি পুলিশের লোক আসিয়া পড়ে! কিন্তু পেচক আর ঝিল্লীরব ছাড়া কোন শব্দই মণ্টুর কানে আসিল না।

দূরে নবদ্বীপের দেবায়তনগুলিতে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মণ্টু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিল, 'ঠাকুর, এই হয়ত তোমাকে

আমার শেষ প্রণাম। অনেক মন্দিরে তোমাকে আমার প্রণাম জানাইনি—কিন্তু তোমার উপর বিশ্বাস আমার চিরদিনই ছিল।'

নিস্তব্ধ অন্ধকার। চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে জোনাকি পোকাগুলি মিটির মিটির জ্বলিতেছে। মণ্টু ভাবিল, নিশ্চয় এ সংবাদ পৌঁছায়নি। ঘোড়াটি হয়ত কোথাও চলিয়া গিয়াছে অথবা কেহ তাহাকে ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। কয়লার লেখা মুছিয়া গিয়াছে কিনা তাহারই বা ঠিক কি! মুছিয়া না গেলেও রাত্রে সে-লেখা আর কে পড়িবে?……কাল সকালে যখন সেই লেখা কাহারও চোখে পড়িবে, তখন মণ্টু আর ইহজগতে থাকিবে না!

একটা জানালার শিক না থাকায় সেখানে লোহার জাল আটিয়া দেওয়া হইয়াছে। মণ্টু উহা খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সমস্ত দিন না খাইয়া তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তাই বলিয়া ইঁদুরের মত মরিতে হইবে নাকি? মণ্টু খানিকটা উপরে উঠিয়া সেই লোহার জালে সজোরে লাথি মারিল।

'সারাউণ্ড্—লাইট।'

পরিচিত কণ্ঠস্বর।

মণ্টু ভাঙ্গা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, বাড়ীর চতুর্দ্দিক সশস্ত্র পুলিশে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের হাতে টর্চ ও বন্দুক। তার পরই একসঙ্গে আওয়াজ হইল,—গুড়ুম্, গুড়ুম্। পরক্ষণেই মণ্টুর ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, মণ্টু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, পূর্ণবাবু—সঙ্গে ইউনিফরম পরা পুলিশ-ইনস্পেক্টর।

এবার ঘনবরকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। সে আসলে উড়িয়াই নয়, পুরাদস্তুর বাঙ্গালী। এক্রাম মিয়াকে ধরার পর ঘনবর নিজে মরা সাজিয়া আর কয়েকজন সঙ্গীকে করিল শববাহী। এইভাবে সে আর সকলের চোখে ধূলি দিয়া সরিয়া পড়ে।

ভাঙ্গা-বাড়ীতে গহনা-পত্রও আবিষ্কৃত হইল; কিন্তু তার মধ্যে মণ্টুর মায়ের গহনা কি করিয়া আসিল? ঠিক সেই তাগা, হার-গাছটির লকেটে ঠিক তেমনি একটি কাল দাগ।

মণ্টু নিজের মায়ের গহনা সনাক্ত করিয়া দিল। পূর্ণবাবু তখন সবিশেষ শুনিয়া মণ্টুর বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন। কেহ কেহ বলিল, 'আরে এই ত' খবরের কাগজের হারানো নিরুদ্দেশের সেই মণ্টু!—এতদিন ত আমরা খেয়ালই করিনি!'

সংবাদ পাইয়া মণ্টুর মা, বৌদি, বাবা সকলে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা এই নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে চোর মণ্টুর মায়ের গহনাগুলি চুরি করে। অপহৃত গহনাগুলি তাঁহারা পাইলেন, আর পাইলেন হারানো ছেলে মণ্টুকে।

—শেষ—

এই লেখকের লেখা

পাগ্লী বুড়ো
আকাশ পথে
হাবুল চন্দোর
রাজা সীতারাম
দুর্গম পথের যাত্রী
বাদলা দিনের গল্প
আমার বন্ধু ভাস্কর
বাংলার কুটীর শিল্প
শিকারী শশী লাঠিয়াল রামতনু